প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

দশম বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, *প্রথম আলো*

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; প্রধান নির্বাহী, নলেজ অ্যালায়েন্স

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, *প্রথম আলো*

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ১০০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
July-September Issue, 2020; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 100 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

রাজনীতি

দক্ষিণ এশিয়ায় শাসনব্যবস্থার চার চ্যালেঞ্জ ৯
আলী রীয়াজ

স্বাস্থ্য অর্থনীতি

স্বাস্থ্য খাতের অর্জন, দুর্নীতিতে বিসর্জন ২১
মো. খায়রুল ইসলাম, শেহলীনা আহমেদ ও শিশির মোড়ল

নৃতত্ত্ব

মহামারি ও আদিবাসী লোকায়ত স্বাস্থ্যবিধি ৪৫
পাভেল পার্থ

রাজনৈতিক অর্থনীতি

করোনা-উত্তর পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়ন ৭৭
মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

মহামারি

মহামারি : ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি ৯৩
শাহাদুজ্জামান

জঙ্গিবাদ

বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেট ও তাদের সহিংসতা জায়েজ করার বয়ান ১০৩
সাইমুম পারভেজ

বইআলোচনা

প্যানডেমিক—জিজেকের দ্রুত ও উত্তেজক ব্যাখ্যা ১৩৫
সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ

লেখক পরিচিতি ১৪১

করোনাকালে সবকিছুর মতো *প্রতিচিন্তা*র প্রকাশনাও বেশ কিছুদিন বন্ধ থেকেছে। তবে *প্রতিচিন্তা*র সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় নতুন সংখ্যা বের করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। অতিমারির প্রাথমিক ধাক্কা সামলানোর মধ্যে *প্রতিচিন্তা*র দুটি সংখ্যার সময় পার হয়ে গেছে। জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা বের করার কথা থাকলেও বের করতে হচ্ছে জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা। কঠিন সময় পার করছে সারা পৃথিবী। সমগ্র মানবজাতিই এক সন্ধিক্ষণের মুখোমুখি। করোনা নতুন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে অনেক কিছু। অনেক ক্ষতির মধ্যেও করোনার সম্ভবত সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হলো সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির ব্যাপারে মানুষের আত্মোপলব্ধি ও পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ পাওয়া। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আলডৌস হাক্সলি যেমনটি বলেছিলেন যে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো মানুষ ইতিহাস থেকে তেমন কোনো শিক্ষা নেয় না। করোনাকালে বরাবরের মতো এটা আবারও যেন সত্য হয়ে উঠল। কারণ, যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি মানুষ হচ্ছে, তা তেমন নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। অতীতের সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে সেই অনুযায়ী অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি ঢেলে সাজালে মানবজাতি এই সংকট আরও সহজে মোকাবিলা করতে পারত হয়তো। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো বিদ্যমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু সংকট মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল অসাড়। করোনা পরিস্থিতিতেও সেই একই ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি ঘটল।

করোনাকালে অনেক প্রিয়জনই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। *প্রতিচিন্তা*ও হারিয়েছে এই পরিবারের একজন উপদেষ্টা। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এই শোক কাটিয়ে উঠতে না-উঠতেই *প্রতিচিন্তা* হারায় তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব লতিফুর রহমানও এই কঠিন সময়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান শুরু থেকেই *প্রতিচিন্তা*কে বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাজাগতিক সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে গেছেন। অন্যদিকে লতিফুর রহমান দিয়ে গেছেন পৃষ্ঠপোষকতা। তবে জীবন-জগতের নির্মোহ নিয়মেই আবারও মানুষ ঘুরে দাঁড়ায়। আমরা বিশ্বাস করি, *প্রতিচিন্তা* নিয়মিত বের করে জ্ঞানচর্চায় যে অবদান রাখার প্রত্যয় এ দুজনের ছিল, সে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারব। তাই আবারও পাঠকের মুখোমুখি হতে *প্রতিচিন্তা*র নতুন সংখ্যা বের করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। করোনাকালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা আমরা পেয়েছি, যা *প্রতিচিন্তা*র পাঠকদের কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

করোনাকালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন তাঁদের মতামত। সেখানে সবারই উদ্বেগের জায়গায় ছিল রাজনীতিতে আরও বেশি কর্তৃত্ববাদের উত্থানের আভাস। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিও বিভিন্ন সমীকরণ পার করছে। এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় বড় কী ধরনের পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে, তা এখনো অনিশ্চিত। কিন্তু আলী রীয়াজ তাঁর লেখায় এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থার চারটি প্রধান চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে এই চার চ্যালেঞ্জ মিলেই এখানকার রাজনীতিতে বড় কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে চাইলে তা ঠেকিয়ে দেয়। ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আনতে হলে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা জরুরি।

করোনাকালে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো স্বাস্থ্য খাতের ভঙ্গুর চিত্র এবং লাগামহীন দুর্নীতির খবর। এ দেশের স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থার চালচিত্র ঠিক কতটা ভঙ্গুর, সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা থাকলেও এমন ব্যাপক অভিজ্ঞতা বোধ হয় আর হয়নি। এসবের পেছনে বড় কারণ হলো এ খাতের দুর্নীতি। মো. খায়রুল ইসলাম, শেহলীনা আহমেদ এবং শিশির মোড়ল মিলে স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের লেখায়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্প বিনিয়োগ করেও এমন বিরাট সাফল্যের কারণে বিশ্বজোড়াই বাংলাদেশ রয়ে গেছে এক রহস্য হিসেবে। এই লেখায় দেখা যায় কীভাবে এ দেশের স্বাস্থ্য খাতের সব অর্জনই ম্লান হয়ে গেছে দুর্নীতির কারণে।

মহামারি এ দেশের মানুষের কাছে কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু বর্তমান করোনা সংকটে লকডাউন, কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন ইত্যাদি নামক যেসব কৌশল ও পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করছি, সেগুলো অনেকাংশেই উপনিবেশ জ্ঞানকাণ্ডের অংশ। পাভেল পার্থর লেখায় মহামারি নিয়ন্ত্রণের এমন এক অনালোচিত বয়ান এসেছে, যা এ বিষয়ের গবেষকদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের

৩০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মহামারি নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব কৌশল তুলে এনেছেন এই লেখক। মহামারি নিয়ন্ত্রণ-কৌশলের বি-উপনিবেশায়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা এই প্রবন্ধ স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের মহামারি নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখবে।

করোনা-পরবর্তী বিশ্বের চরিত্র কেমন হবে, সেটা ইতিমধ্যেই একটি বড় আলোচনার বিষয়। সারা পৃথিবীরই জ্ঞানচর্চায় এ নিয়ে চলছে তুমুল গবেষণা, তর্ক। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ধারণা দুটো হলো পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়ন। করোনার কারণে এ দুটো ধারণাও সংকটে পড়েছে। পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়ন বিষয়ে বিস্তর সমালোচনা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী চলমান বৈষম্যের পেছনে এ দুটো ব্যবস্থারই সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা সবারই আগ্রহের বিষয়। কারণ, এ দুটো ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সমাজকাঠামো ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। মুহাম্মদ তানিম নওশাদ তাঁর লেখায় এ দুটো বিষয়ের সূত্র ধরে বিবিধ প্রসঙ্গ টেনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন হাজির করেছেন।

মহামারির ইতিহাস এবং সমাজ ও রাজনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে লিখেছেন কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামান। মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহামারির উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন পুরো বিষয়টির সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব। প্রাচীনকাল, মধ্যযুগ ও বর্তমান কালের মহামারির অভিজ্ঞতা ঘেঁটে তিনি মহামারির রাজনীতি তুলে এনেছেন।

জঙ্গিবাদ বর্তমান বিশ্বের একটি চলমান সংকট। এ বিষয়ে বিতর্ক ও আলোচনাও অন্তহীন। কিন্তু সাইমুম পারভেজ তাঁর লেখায় জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেটের (আইএস) কৌশল ও কাজের ধরনে পরিবর্তন প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হাজির করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে আইএস সংগঠন হিসেবে সরাসরি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘাঁটি না গেড়ে স্থানীয় দোসরদের মাধ্যমেই তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কৌশলের এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া রয়েছে অগ্রাধিকার তালিকায়। কিন্তু বাংলাদেশে আইএসের ভূমিকা কী হবে, সে বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। সেই ঘাটতি পূরণে এ লেখা একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

প্রতিচিন্তার এবারের বই আলোচনায় রয়েছে বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত দার্শনিক স্লাভয় জিজেকের *প্যানডেমিক* বইটির আলোচনা। হেগেলের ভাবশিষ্য জিজেক দার্শনিক লাকা, মার্ক্স ও ফুকোর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করার জন্য বিখ্যাত। এ বইয়েও তিনি যথারীতি করোনা সংকটকে এসব দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। 'নিও কমিউনিজম' সম্পর্কে নিজের ধারণা স্পষ্ট করা এই বই লিখে জিজেক করোনা নিয়ে বই প্রকাশ করা প্রথম দার্শনিক হিসেবে বরাবরের মতোই আলোচিত হয়েছেন। বইটি আলোচনা করেছেন সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ।

রাজনীতি

দক্ষিণ এশিয়ায় শাসনব্যবস্থার চার চ্যালেঞ্জ

আলী রীয়াজ

ভূমিকা

গভর্ন্যান্স বা শাসনব্যবস্থা শব্দটির কোনো সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। বিগত আশির দশক থেকে শাসনব্যবস্থার বিষয়টি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নীতিনির্ধারক ও একাডেমিক সবাই একমত যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক—দুই ক্ষেত্রেই উন্নয়ন ঘটাতে হলে শাসনব্যবস্থার বিকল্প নেই। তা ছাড়া বিষয়টি একা সরকারের হাতেও ছেড়ে দেওয়া যাবে না। কয়েক দশক ধরে শাসনব্যবস্থার ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। এর আওতা বেড়ে সেখানে রাষ্ট্র, বাজার, ও নাগরিক সমাজ অ্যাক্টর বা কর্মক যুক্ত হয়েছে। কফম্যান ও অন্যরা শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'যে প্রক্রিয়ায় সরকার বাছাই হয়, সরকারকে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সেই সরকার বদল হয়; সরকারের সুস্থির নীতি কার্যকরভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা থাকে; এবং যেসব প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্তক্রিয়া পরিচালনা করে, সেগুলোর প্রতি নাগরিক ও রাষ্ট্রের শ্রদ্ধা থাকা' (Kaufman et al 2013)। এই সংজ্ঞায় 'সরকার বাছাই, পর্যবেক্ষণ ও বদলের' প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ হলো গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা। তবে অন্যদিকে ফুকুয়ামা শাসনব্যবস্থার উপাদান হিসেবে গণতন্ত্র বা যেকোনো ধরনের নাগরিক প্রতিনিধিত্বের ধারণা বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, শাসনব্যবস্থা হলো 'কোনো সরকারের নিয়মনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা এবং সেবা প্রদানের ক্ষমতা; সেই সরকার গণতান্ত্রিক কি না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়' (Fukuyama 2013)। তিনি বলেন, 'শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে যেসব উদ্দেশ্য সাধনের কথা বলা হয়, সেগুলো শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ থেকে আলাদা। অর্থাৎ, শাসনব্যবস্থা হলো সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেসব ইচ্ছা পোষণ করে, সেগুলো বাস্তবায়নে প্রতিনিধিদের

● অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

কার্যদক্ষতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লক্ষ্য বিষয়ে শাসনব্যবস্থার কিছু করার নেই।' তবে শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা, পরিধি ও ধরন বিষয়ে বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও সাধারণ আলোচনায় শাসনব্যবস্থা কথাটা প্রায়োগিক অর্থেই বোঝানো হয় (Riaz 2018: 31-67)। প্রায়োগিক অর্থে শাসনব্যবস্থা বলতে বোঝানো হয় দক্ষ ও নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে জনসেবা প্রদান করা এবং আর্থসামাজিক কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন। এসবের অনুপস্থিতির কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা, উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর উত্থান এবং সরকারের ওপর জনগণের আস্থা হারানোর মতো রাজনৈতিক অসুস্থতা সারা পৃথিবীতেই চোখে পড়ে। এ রকম প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে পরিমাপ করলে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় শাসনব্যবস্থার অবস্থা খুবই নাজুক। বিশ্বব্যাংকের বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা সূচক বা ওয়ার্ল্ড গভর্ন্যান্স ইন্ডিকেটরে বহু বছর ধরেই এই নাজুক অবস্থার নজির দেখা গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে এ লেখায় যে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো দক্ষিণ এশিয়ায় শাসনব্যবস্থার মৌলিক চ্যালেঞ্জ কী? আমার মতে, দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই চারটি চ্যালেঞ্জ মিলে যেকোনো ধরনের বড় পরিবর্তনে বাধা তৈরি করে। এই চ্যালেঞ্জগুলো হলো রাষ্ট্রীয় বৈধতার বিবাদপূর্ণ উৎস, শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তির অভাব, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি এবং নব্য পিতৃতন্ত্রবাদ (Neopatrimonialism)। দক্ষিণ এশিয়ায় শাসনব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর যেকোনো প্রচেষ্টা এবং ভবিষ্যতের করণীয় ঠিক করতে গেলে আন্তরিকভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় বৈধতার বিবাদপূর্ণ উৎস

জাতিরাষ্ট্রের, এমনকি তার প্রাথমিক রূপেরও ভিত্তি হলো নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠান। ইউরোপে উনিশ শতকে জাতিরাষ্ট্রের সূচনা হয়। এরপর উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং জাতিরাষ্ট্রের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় এর অনুকরণের সময় থেকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জাতির প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য অন্য সব আনুগত্যকে ছাড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ গোত্র, গোষ্ঠী, পরিবার ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে জাতিবোধের প্রতি আনুগত্য বাকি সবকিছু থেকে বেশি হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিরাষ্ট্র হলো উপনিবেশ সময় বা তার ধারণা থেকে সৃষ্টি। তাই ইউরোপ থেকে ছড়ানো জাতিরাষ্ট্রের ধারণাই এখানে অনুসরণ করার কথা। ঐতিহ্যগত অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের বদলে আধুনিক আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোই ক্ষমতার উৎস হওয়ার কথা। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও বিধিবদ্ধ আইনের বাস্তবায়ন থাকা সত্ত্বেও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সম্প্রতি নেপালে রাজতন্ত্রের বিলোপ এবং ভুটানের রাজার অনেক রাজকীয় ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফলে এমন একটা ধারণা জন্মেছে যে দক্ষিণ এশিয়ায়

এবার বুঝি ক্ষমতার বৈধতার আনুষ্ঠানিক উৎসের বিকাশ ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলোতে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের নিচে বহু বছর ধরে টিকে থাকা প্রথাগত সামাজিক চর্চা ও শ্রেণিবিন্যাস এখনো প্রবল ক্ষমতার উৎস। এসব ক্ষমতা প্রায়ই রাষ্ট্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। উদাহরণস্বরূপ, আফগানিস্তানে কওম (qwam) বা গ্রামীণ, গোষ্ঠীতান্ত্রিক ও পারিবারিক সম্পর্ক এখনো আফগান মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। টমাস বারফিল্ড তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আফগানিস্তান : আ কালচারাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল হিস্ট্রি*তে লিখেছেন, 'মানুষের প্রাথমিক আনুগত্য হলো যথাক্রমে আত্মীয়, গ্রাম, গোত্র, অথবা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর প্রতি, সাধারণত যাকে বলা যায় কওম' (Barfield 2011 : 18)। পাকিস্তানের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় প্রবল শক্তিশালী 'জিরগা' (jirga) আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রের সমান্তরালে কাজ করে। সেখানে অনেক সময় এই জিরগা ক্ষমতার বৈধতার প্রাথমিক উৎসও বটে। ভারতের বর্ণপ্রথা সরকারিভাবে স্বীকৃত হতে না পারে, কিন্তু এর প্রভাব অস্বীকার করারও উপায় নেই। এই বর্ণপ্রথাই নির্ধারণ করে কার হাতে ক্ষমতা থাকবে। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় পুঁজিবাদী উন্নয়ন প্রবেশ করার ফলে 'সমাজের' প্রভাব কমে এসেছে। এর ফলে প্রথাগত প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কও দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। অনেক ক্ষেত্রেই নতুন অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং মধ্যস্থতার নতুন ক্রীড়নক হিসেবে হাজির হয়েছে। ধর্ম ও দেশনির্বিশেষে সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা-ই হলো দক্ষিণ এশিয়ার শাসনব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত ক্ষমতা থাকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মতো অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থার হাতে। দক্ষিণ এশিয়ায় এ দুটো বিষয় অনেক সময়ই একাকার হয়ে আছে। ব্রিটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ মিক মুর বলেন, চার ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র রয়েছে। তবে ভঙ্গুর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেগুলো প্রযোজ্য নয়। এই চার ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন, স্বল্প পরিমাণে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত রাষ্ট্র, প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত প্রতিযোগিতাহীন রাষ্ট্র এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত প্রতিযোগিতামূলক রাষ্ট্র (Moore 2001 উদ্ধৃত Grindle 2007)। এই প্রতিটি ধরনের ভিন্ন ভিন্ন সক্ষমতা রয়েছে। তাদের বৈধতার মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। মুরের মতে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনের ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত সংযোগের ওপর। রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রচণ্ডভাবে ক্ষমতার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে। শাসনের নিয়মকানুনগুলো যেসব বিষয়ের ওপরে জোর দিয়ে তৈরি করা হয়, তা হচ্ছে এলিটদের ক্ষমতা ও এলিটদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

এ ধরনের ব্যবস্থার বৈধতা খুবই কম। স্বল্প পরিমাণে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক শাসনের এক অস্থিতিশীল মিশ্রণ দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো অংশত নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের ওপর এবং রাষ্ট্রের বৈধতার মাত্রা হলো কম থেকে মধ্যম পর্যায়ের। প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত প্রতিযোগিতাহীন রাষ্ট্র পরিচালিত হয় স্থিতিশীল এবং বৈধ সংগঠন ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রাষ্ট্রের বৈধতার মাত্রা এ ক্ষেত্রে মধ্যম পর্যায়ের। প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত প্রতিযোগিতামূলক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় স্থিতিশীল এবং বৈধ সংগঠন ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৈধতার মাত্রা সর্বোচ্চ।

দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ দেশেই ক্ষমতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ক্ষমতার ব্যক্তিকেন্দ্রীকরণের মাত্রার বিবেচনায় এসব দেশকে বড়জোর স্বল্প পরিমাণে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত বলা যেতে পারে। ক্ষমতার ব্যক্তিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় বৈধতাও ক্রমাগত প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ফান্ড ফর পিসের 'স্টেট ফ্রেজিলিটি ইনডেক্স' বা রাষ্ট্রীয় ভঙ্গুরতা সূচক অনুসারে 'রাষ্ট্রীয় বৈধতার' ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো বরাবর খারাপ স্কোর করার এটি একটি কারণ। ০ (শূন্য) থেকে ১০ (দশ) স্কেল, যেখানে ১০ মানে সবচেয়ে খারাপ, সেই স্কেলে ভারত ছাড়া বাকি দেশগুলো বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে খারাপ স্কোর করছে। পাকিস্তানের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এরপরই রয়েছে বাংলাদেশ।

চিত্র ১ : রাষ্ট্রীয় বৈধতার সূচক

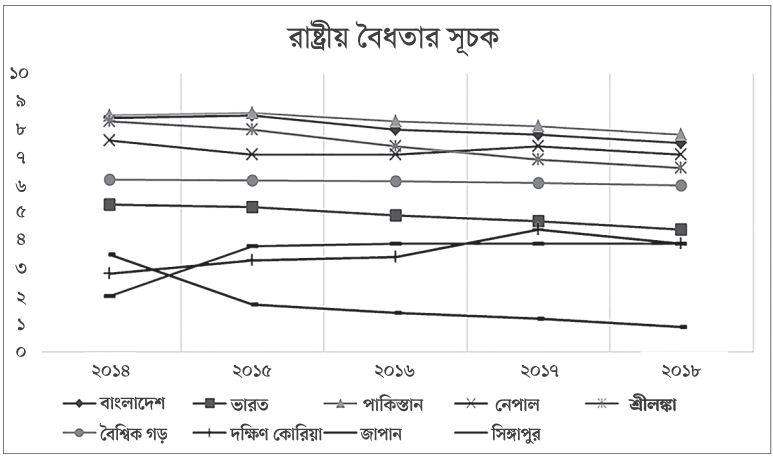

সূত্র : ফান্ডস ফর পিস, ফ্রেজাইল স্টেট ইনডেক্স, https ://fragilestatesindex.org/analytics/

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব, যা বৈধতার সংকট তৈরি করছে, তার একটি অন্যতম উৎস হলো ধর্মীয়

পরিচয়ের প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি পাওয়া। বহুদিন ধরেই পাকিস্তান নিজেকে মুসলিম জাতি হিসেবে পরিচয় দিয়ে আসছে। তবে দেশটি বলার চেষ্টা করে যে সে ইসলামি দেশ নয়। তাই এর রাষ্ট্রীয় বৈধতাও ধর্মীয় কর্তৃত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র এর বৈধতার প্রশ্নে ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দিয়েছে। ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বিজয়ী হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের বহুদিন ধরে লালিত অন্তর্ভুক্তিতার আদর্শ মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়েছে কি না এবং অন্তর্ভুক্তিতা ভারতের মূলনীতি আর রয়েছে কি না, সে বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির জনতুষ্টিবাদী কর্তৃত্ববাদের অর্থ হলো ভারতের রাষ্ট্রীয় বৈধতার ভিত্তি কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বদলে ধর্মীয় পরিচয়ের দিকে মোড় নেওয়া। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রে রক্ষণশীল ইসলামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব স্পষ্ট। তা ছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্ষমতাসীন দল স্পষ্টভাবেই ধর্মীয় আবরণ গ্রহণ করেছে, রক্ষণশীল ইসলামপন্থীদের নিজের বন্ধু বানিয়েছে এবং বারবার তাদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করেছে। এটা হলো আধা কর্তৃত্ববাদী ঝোঁকের ফলাফল। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক অংশে এই ঝোঁক দেখা যায়। মালদ্বীপে ধর্ম ও ধর্মীয় মতের প্রতি আগ্রহ বেড়ে চলা এবং ধর্মের ভিত্তিতে শ্রীলঙ্কায় সামাজিক বিভেদ থেকে এই পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তির অভাব

রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তির অভাব শাসনব্যবস্থার দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি বলতে বোঝানো হচ্ছে নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং সরকারের জবাবদিহি। অর্থাৎ যাদের শাসন করা হয়, তাদের অংশগ্রহণ আর যারা শাসন করে, তাদের জবাবদিহি। যদিও দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশেই আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র চর্চা করা হয়, তবু এসব দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠস্বরকে জায়গা দেওয়ার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। বিশ্ব শাসনব্যবস্থা সূচকের একটি হচ্ছে কণ্ঠস্বর ও জবাবদিহি সূচক। এই সূচকের স্কেল হলো বিয়োগ (-) ২ দশমিক ৫ থেকে ২ দশমিক ৫। দেখা যায়, বিগত প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে ভারত ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার বাকি সব দেশই শূন্যের নিচে অবস্থান করছে (২০০৭-২০১৭)।

ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির অভাবের স্পষ্ট কারণ হলো নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আর ধর্ম। ভিন্ন কণ্ঠস্বর অন্তর্ভুক্ত করা এবং জায়গা দেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও কাশ্মীর, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়া, শ্রীলঙ্কার তামিল প্রশ্ন এবং নেপালের তরাই/মাধেসি ইস্যু থেকে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলও একই শ্রেণির অন্তর্গত। এসব অভিজ্ঞতার ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন

ওঠে যে দক্ষিণ এশিয়ার জাতিরাষ্ট্রগুলো কি 'সংখ্যালঘুদের' পার্থক্য ও স্বকীয়তা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়? জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্নে উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ এবং ধর্মীয়ভাবে ভিন্ন, অর্থনৈতিকভাবে অসম এবং সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয় বিধান করার পরিবর্তে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা হয়ে উঠেছে সংখ্যাগরিষ্ঠবাদের হাতিয়ার। এটি আরও খারাপ অবস্থার দিকে মোড় নেয়, যখন এসব বিষয়কে 'নিরাপত্তা প্রশ্ন' নামে আখ্যায়িত করে 'সামরিক সমাধান' খোঁজা হয়। এর ফলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আরও প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায়। ফলে রাষ্ট্রের বৈধতা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা বা সেক্টেরিয়ানিজমের মতো বিষয় এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। রাষ্ট্রের দিক থেকে জেন্ডারবিষয়ক সংবেদনশীলতা এবং সক্রিয় নীতিসহায়তা না থাকায় নারীরা অনেক পেছনে পড়ে আছে। রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় গুটি কয়েক নারীর প্রতীকী উপস্থিতি দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের পুরুষতান্ত্রিক চেহারা ঢেকে ফেলা যায় না।

চিত্র ২ : কণ্ঠস্বর ও জবাবদিহি

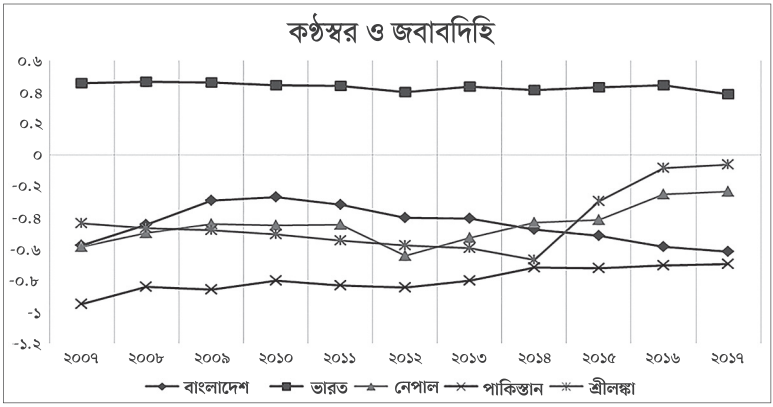

সূত্র : ওয়ার্ল্ড গভর্ন্যান্স ইন্ডিকেটর, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক https ://info.worldbank.org/governance/wgi/

নব্বইয়ের দশকের পর থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নয়া উদারনীতিবাদের নীতি বাস্তবায়ন করার ফলে এই প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া আরও বেশি জোরালো হয়েছে। 'উন্নয়নবাদী' যুক্তি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি বিষয়ে ঘোর এবং সংস্কারের নামে ব্যবসাবান্ধব নীতির ফলে বিশ্বায়নের সুবিধা পাওয়া গেছে, কিন্তু বৈষম্য আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। যেমন ২০১৮ সালের জরিপে দেখা গেছে, ভারতের সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশ লোক মোট সম্পদের ৫৮ শতাংশের মালিক। এই হার বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি। নয়া উদারনীতিবাদী নীতির ফলে একই সঙ্গে একটি স্থায়ী অবহেলিত জনগোষ্ঠী

এবং একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম নিয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়, এমন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি নতুন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির ঝোঁক রয়েছে। এই প্রবণতা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদ বিস্তারে সহায়তা করছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে নতুন এসব নীতির ফলে রাষ্ট্রের কার্যক্ষমতা বাড়েনি। রাষ্ট্রের কার্যক্ষমতার সূচকে দেখা যায় চারটি দেশ ক্রমাগত শূন্যের নিচে থাকছে (-২ দশমিক ৫ থেকে ২ দশমিক ৫ স্কেলে)। গোটা অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের আস্থা বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেছে।

চিত্র ৩ : সরকারের কার্যক্ষমতা

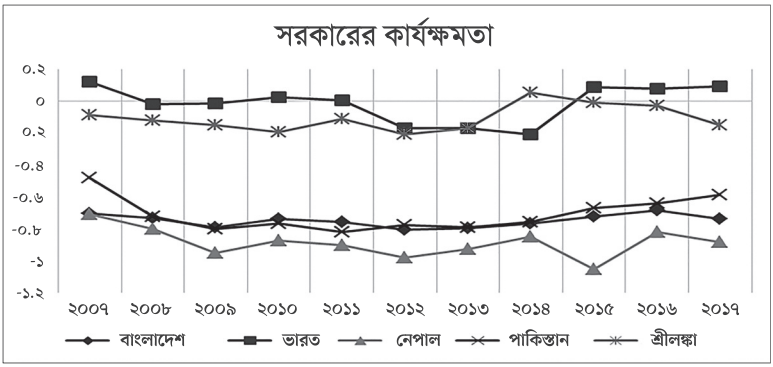

সূত্র : ওয়ার্ল্ড গভর্ন্যান্স ইন্ডিকেটর, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক https ://info.worldbank.org/governance/wgi/

আইনের শাসনের অনুপস্থিতি

রাষ্ট্রের ব্যক্তিকেন্দ্রীকরণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সম্ভব হয়েছে আইনের শাসনের ক্রমাগত অবনতির কারণে। যে কারণে আমি দক্ষিণ এশিয়ায় শাসনব্যবস্থার তৃতীয় চ্যালেঞ্জ বলে চিহ্নিত করতে চাই আইনের শাসনের অনুপস্থিতি। ভারত ছাড়া এই অঞ্চলের বাকি দেশগুলোয় শুরু থেকেই বিচারব্যবস্থাসহ দুর্বল প্রতিষ্ঠান ছিল। তবে স্বাধীন বিচারব্যবস্থা না থাকার কারণ শুধু ঐতিহাসিক পরম্পরাই নয়; সামরিক-বেসামরিক দুই ধরনের ক্ষমতাসীন এলিটরাই কখনো চায়নি তাদের কাজের ওপর কোনো সাংবিধানিক প্রহরী কর্তৃত্ব খাটাক। বিশ্ব ন্যায়বিচার প্রকল্পের উপাত্ত থেকে দেখা যায় অতীতে ০ থেকে ১ স্কেলে (১ মানে সর্বোচ্চ) দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থা সব সময়ই খারাপ ছিল। যেমন ২০১৯ সালে পাকিস্তানের স্কোর ছিল সবচেয়ে কম, শূন্য দশমিক ৩৯। তারপরই শূন্য দশমিক ৪০ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশ খারাপ স্কোর করা দেশগুলোর মধ্যে ছিল দ্বিতীয়। নেপাল

শূন্য দশমিক ৫২ স্কোর নিয়ে এই অঞ্চলে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছে। আইনের শাসনের অনুপস্থিতি থাকায় মৌলিক সমস্যা হলো সব নাগরিক সমান মর্যাদা পায় না। তাই তারা রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে মনে করে না।

চিত্র ৪ : আইনের শাসন

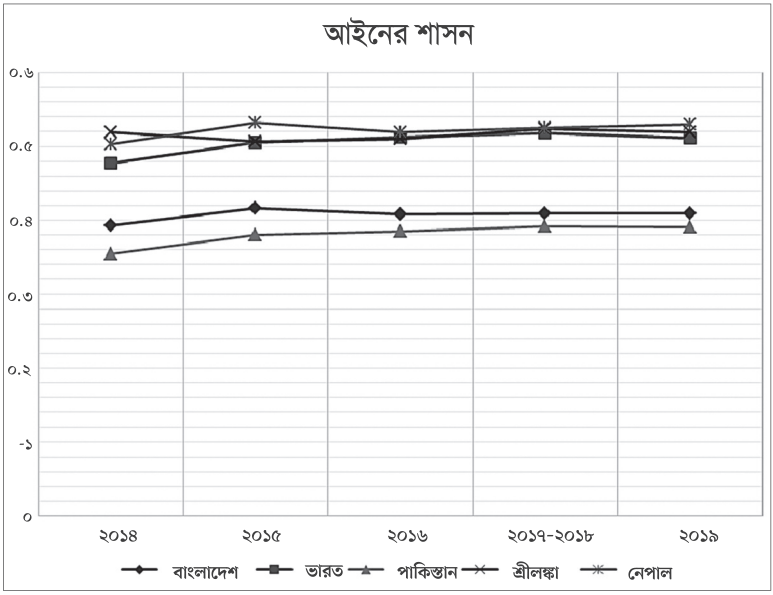

সূত্র : ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট; https ://worldjusticeproject.org/

নব্য পিতৃতন্ত্রবাদ (Neopatrimonialism)

দক্ষিণ এশিয়ায় শাসনব্যবস্থার চতুর্থ চ্যালেঞ্জ হলো এমন এক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপস্থিতি, যাকে নব্য পিতৃতন্ত্রবাদ বললে সবচেয়ে ভালোভাবে বর্ণনা করা যায়। সহজ ভাষায় বললে নব্য পিতৃতন্ত্রবাদ অর্থ হলো ব্যক্তিগত লাভের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করা। পিতৃতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্কধর্মী। এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের ধরন এমন যে বশ্যতা ও আনুগত্য হয় ব্যক্তি বা পরিবারভিত্তিক। কিন্তু এর্ডম্যান এবং এঙ্গেলের মতে, নব্য পিতৃতন্ত্রবাদ হলো 'দুটো সহ-অবস্থিত অংশত একত্রিত ধরনের কর্তৃত্ব : যেমন পিতৃতান্ত্রিক এবং আইনি যুক্তিসংগত আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব' (Erdman and Engle 2006 : 18)। শাসনব্যবস্থার কিছু আনুষ্ঠানিক উপাদানের মোড়কে ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব ব্যবস্থা চালু থাকে। নব্য পিতৃতন্ত্রবাদী ব্যবস্থায় আইনি নিয়মকানুন

ও প্রক্রিয়ার পাশাপাশি প্রথাগত নিয়মকানুন ও সম্পর্কও বজায় থাকে। নব্য পিতৃতন্ত্রবাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে ক্রিস্টোফার ক্ল্যাপহাম বলেন, 'এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে বৃহৎ আকারে পিতৃতান্ত্রিক ধরনের সম্পর্কগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তিসংগত আইনি কাঠামোর আলোকে নির্মিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করে' (Clapham 1985 : 48)।

দুর্নীতির পরিসংখ্যান থেকে ভালোভাবেই দেখা যায় যে দক্ষিণ এশিয়ায় নব্য পিতৃতন্ত্রবাদ বাধাহীন হয়ে উঠেছে। বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় এখনো রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক সম্পদের প্রধান উৎস। সম্পদ বণ্টনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীও নির্বাহী বিভাগ। স্বজনতোষী পুঁজিবাদ, দুর্নীতি এবং রেন্ট সিকিং বা সরকারি নীতি প্রভাবিত করে ব্যক্তিগত মুনাফা লাভ হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। দৃশ্যত দল ও ক্ষমতাসীন এলিটদের মধ্যে রেন্ট সিকিংকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। যেমন নওয়াজ বলেছেন, 'নব্য পিতৃতন্ত্রবাদের মৌলিক কাঠামো তিনটি খাতের সংমিশ্রণ: 'ভেতর', 'বাহির' এবং সরকার। 'ভেতরকে' (মক্কেল, নিজের লোক ইত্যাদি) পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার মাধ্যমে সরকার নিজের সমর্থন আদায় করে এবং 'বাহিরের' ওপর কর আরোপ করে 'ভেতরের' অর্থের জোগান দেয় ((Nawaz 2008 :2)। দক্ষিণ এশিয়া এর ব্যতিক্রম নয়। নব্য পিতৃতন্ত্রবাদী ব্যবস্থার ফলে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হয়। দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এর প্রভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বাইরেও বিস্তৃত। কারণ, এর ফলে রাষ্ট্রের জবাবদিহি ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন দুর্বল হয়ে যায়।

চিত্র ৫ : সামাজিক ন্যায়বিচার

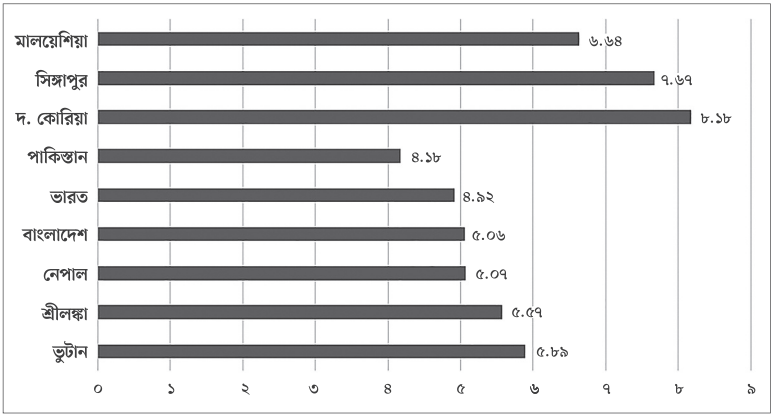

সূত্র : বিটিআই, বার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশন, ২০১৮

উপসংহার

এই চারটি চ্যালেঞ্জ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে দুঃশাসনের এক ফাঁদ তৈরি করে। এর ফলে এমন এক ব্যবস্থা স্থায়ী হয়, যা নাগরিকদের বড় অংশের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয় এবং নাগরিকদের আরও বেশি প্রান্তিক করে ফেলে। খারাপ শাসনব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা, উগ্রবাদী গোষ্ঠীর উত্থান এবং সরকারের ওপর নাগরিকদের আস্থার অবনতি। কিন্তু এখানেই তা সীমাবদ্ধ থাকে না; এর বাইরেও এর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। দুর্বল গণতন্ত্র আরও বেশি দুর্বল হয় এবং একটি অন্যায্য সমাজ সৃষ্টি করে। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রেও নিচের দিকে (চিত্র ৫)।

'দক্ষিণ এশিয়ায় একুশ শতকে শাসনব্যবস্থা বিষয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন : চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক অনুষ্ঠানে লেখকের দেওয়া বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। ২০১৯ সালের ৭-৮ জুলাই তারিখে এই সম্মেলন আয়োজন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ'

তথ্যসূত্র

Barfield, Thomas. 2011. *Afghanistan : A Cultural and Political History*. New York : Princeton University Press.

Clapham, Christopher. 1985. *Third World Politics : An Introduction*. Madison, WI : The University of Wisconsin Press.

Fukuyama, Francis. 2013. 'What Is Governance?' Working Paper No. 314. Washington, DC : Center for Global Development.

Erdmann Gero and Ulf Engel 2006. 'Neopatrimonialism Revisited—Beyond a Catch-All Concept' GIGA Working Paper 16, February 2016. Hamburg : German Institute of Global and Area Studies.

Grindle, Merilee S. 2007. 'Good Enough Governance Revisited', *Development Policy Review*, 2007, 25 (5) : 553-574.

Kaufmann, Daniel, AartKraay and Massimo Mastruzzi. 2013. 'The Worldwide Governance Indicators : Introduction.' Retrieved from http ://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc-intro.

Moore, Mick. (2001. 'Understanding Variations in Political Systems in Developing Countries : A Practical Framework.' Unpublished paper.

Nawaz, Farhana. 2008. 'Corruption and resource distribution in neopatrimonial systems.' U4 :Utstein Anti-Corruption Resource Centre, https ://www.u4.no/publications/corruption-and-resource-distribution-in-neopatrimonial-systems.pdf

Riaz, Ali. 2018. *Undying Issues : Critical Debates about Contemporary Challenges*. Dhaka : Pathak Samabesh.

World Bank, 2019, Worldwide Governance Indicators. Washington D.C. : World Bank. https ://info.worldbank.org/governance/wgi/

পরিশিষ্ট

রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রেজিম এবং রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা

রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধরন	বৈশিষ্ট্য	রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা	রাষ্ট্রের সাংগঠনিক সক্ষমতা	রাষ্ট্রীয় বৈধতার মাত্রা	বিদ্যমান নীতির ধরন
ব্যক্তিগত শাসন	ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের ভিত্তিতে শাসন। রাজনৈতিক দল যদি থাকেও, সেগুলো ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল	স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে নির্ভর করে ক্ষমতার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের ওপর। পুরো ব্যবস্থা এলিটদের ক্ষমতা এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের ওপর জোর দেয়। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে সংঘাত থাকে।	কম। ক্ষমতাশালী এলিটদের ব্যক্তিগত এবং পরিবর্তনশীল অগ্রাধিকার অনুযায়ী সংগঠন সাড়া প্রদান করে।	কম। ক্ষমতা খাটানোর অধিকার কার, সে বিষয়ে প্রায়ই বিতর্ক থাকে। ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়।	নীতিগুলো অস্থিতিশীল। প্রধান লক্ষ্য হলো যারা ক্ষমতায় আছে, তাদের শক্তিশালী ও ধনী বানানো। অল্প কিছু সরকারি সেবা প্রদান করা হয়।
স্বল্প পরিমাণে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত রাষ্ট্র	ব্যক্তিগত ও নৈর্বক্তিক শাসনের অস্থিতিশীল মিশ্রণ। বৈধতার মাত্রা বিভিন্ন রকমের। দলগুলো অংশত ব্যক্তিত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।	শাসনের মৌলিক নিয়মকানুনই প্রতিষ্ঠিত আইন ও চর্চায় পরিণত হয়, যদিও সেগুলোর প্রয়োগ নিম্নমানের এবং সব সময় এক রকম নয়।	কম/মাঝারি। কিছু সংগঠন থাকতে পারে, যেগুলো স্থায়ী ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করতে পারে।	কম/মাঝারি। দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রতিষ্ঠান বিষয়ে ঐকমত্যের অভাবে ক্ষমতা চর্চার অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব বিরাজমান।	মৌলিক কতগুলো সরকারি ও কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের সংগঠন বিদ্যমান। কিন্তু এসব সেবা প্রদানের আওতা থাকে বিচ্ছিন্ন/বিক্ষিপ্ত এবং প্রায়ই পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধরন	বৈশিষ্ট্য	রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা	রাষ্ট্রের সাংগঠনিক সক্ষমতা	রাষ্ট্রীয় বৈধতার মাত্রা	বিদ্যমান নীতির ধরন
প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত প্রতিযোগিতাহীন রাষ্ট্র	স্থিতিশীল ও বৈধ সংগঠন এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাসন; ক্ষমতার জন্য কোনো উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নেই। রাজনৈতিক দলগুলো রেজিমের স্বার্থ দেখভাল করে অথবা এই রেজিম এসব দলকে বাধাগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রণ করে।	শাসনের স্পষ্ট নিয়মকানুন এবং সাধারণত সিদ্ধান্ত প্রণয়নের শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়া রয়েছে; সাধারণত কেন্দ্রীভূত ও কর্তৃত্ববাদী চর্চা রয়েছে।	মাঝারি। অনেক সংগঠনই স্থায়ীভাবে নিয়মমাফিক কাজকর্ম চালায়।	মাঝারি। দৈনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য বৈধতা রয়েছে, কিন্তু প্রায়ই বৈধতার শিকড় বিষয়ে বড়সড় প্রশ্ন ওঠে, কেননা, তা সম্মতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি।	বহু রকমের মৌলিক ও কল্যাণমূলক সেবা প্রদান করা হতে পারে, কিন্তু কতটুকু দেওয়া হবে এবং এর ধরন কী হবে, সে বিষয়ে নাগরিকদের কোনো প্রভাবই নেই।
প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত প্রতিযোগিতামূলক রাষ্ট্র	বৈধ সংগঠন এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থিতিশীল শাসন; কর্মসূচিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতার জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা	শাসনের নিয়মকানুন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং সেখানে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা যায় না। নিয়মের মাধ্যমে আবেদন করে দ্বন্দ্ব নিরসন করা হয়।	উচ্চমাত্রা। স্থায়ী ভিত্তিতে কার্যদক্ষতা উন্নত করতে সংগঠনগুলো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।	উচ্চমাত্রা। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও ক্ষমতার চর্চার ক্ষেত্রে বৈধতা রয়েছে। এমনকি যখন সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে ভিন্নমত থাকে, তখনো সেই বৈধতা বিদ্যমান থাকে।	ব্যাপক আকারে মৌলিক ও কল্যাণমূলক সেবা প্রদান করা হয়। এসব সেবার আওতা ও ধরন রাজনীতিতে বড় বিষয়ে পরিণত হয়।

মুরের (Moore) ২০০১ সালের ধারণা অবলম্বনে তৈরি, যা উদ্ধৃত হয়েছিল ২০০৫ সালে গ্রিন্ডলের (Grindle) কাজে ।

স্বাস্থ্য খাতের অর্জন, দুর্নীতিতে বিসর্জন

মো. খায়রুল ইসলাম, শেহলীনা আহমেদ ও শিশির মোড়ল

ভূমিকা

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ২০১৩ সালে *ল্যানসেট* সাময়িকীতে বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখেছেন, 'কয়েক দশক আগেও যে দেশ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র এবং এখনো খুবই দরিদ্র, সে দেশ কীভাবে স্বাস্থ্য খাতসহ সার্বিকভাবে সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে এমন চমৎকার অর্জন সাধন করতে পারে, তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।' প্রশংসাসূচক এই মন্তব্য তিনি করেছেন স্বাস্থ্য খাতের বেশির ভাগ সূচকে বাংলাদেশের বাস্তব উন্নতি সাধনের স্বীকৃতি হিসেবে এবং প্রতিবেশী দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো করার প্রেক্ষাপটে। যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে, তার মধ্যে রয়েছে পাঁচ বছর বয়সের নিচে শিশুদের বেঁচে থাকার হার, গড় আয়ু, টিকাদান এবং যক্ষা নিয়ন্ত্রণ। স্বাস্থ্য খাতে স্বল্প বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও এমন চমৎকার অর্জন সাধনের কারণে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের চোখে বাংলাদেশ 'বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সূচকে বিরাট রহস্য' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের উন্নতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছেন : 'পরিবর্তনের উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের যোগসূত্র আছে বিভিন্ন আঙ্গিকে, যার ফলে নারীর স্বাধীনতাসহ সার্বিক মুক্তির বিষয়টি হয়ে উঠেছে প্রগতিশীল আলোচ্যসূচির অংশ। এটাই মানুষ চেয়েছে এবং এর জন্য তারা লড়াই করতে প্রস্তুত।' বাংলাদেশের ওপর *ল্যানসেট* সাময়িকীর সিরিজে যথার্থই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে পরিবর্তনের যে উদ্দীপনা, তার সঙ্গে ১৯৭১ সালে দেশটির মুক্তিযুদ্ধের যোগসূত্র রয়েছে। সে সময়ের রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলনে সামষ্টিক চেতনা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার ভিত্তি ছিল উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, যা পরিবার পরিকল্পনা, নারীর ক্ষমতায়ন, মেয়েশিশুদের শিক্ষা

ইত্যাদি বিষয়ে পরিণত হয়। সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত একটি সমাজের দৃশ্যকল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার চেতনা সমানভাবে ছিল। এই দৃশ্যকল্পে স্বাস্থ্য খাতও অন্তর্ভুক্ত। তবে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে। এমনিতেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক অর্থনীতি ছিল দুর্বল; তার ওপর ৯ মাসের সামরিক হামলায় দেশের ভঙ্গুর অবকাঠামো, অর্থনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক রসদ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে দুর্নীতির অভিঘাত অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বিষহ ও জটিল করে ফেলে।

'আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না। আমার শ্রমিক? না। তাহলে ঘুষ খায় কারা? ব্ল্যাক মার্কেটিং করে কারা? বিদেশি এজেন্ট হয় কারা? বিদেশে টাকা চালান দেয় কারা? হোর্ড করে কারা? এই আমরা, যারা শতকরা ৫ জন শিক্ষিত। এই আমাদের মধ্যেই ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। আমাদের চরিত্রের সংশোধন করতে হবে, আত্মশুদ্ধি করতে হবে।'

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ তারিখে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বশেষ জনসভার বক্তৃতা থেকে।

বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২-৭৫ সময়কালে বেশ কিছু বক্তৃতায় লাগামহীন দুর্নীতির ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। তবে তাঁর সতর্কবার্তার কোনো প্রভাব পড়েছিল কি না, তা বলা কঠিন। কারণ, সে সময়কালে দুর্নীতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো দলিলপত্র নেই। জনসমক্ষে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর শেষ বক্তৃতা থেকে দুর্নীতির চিত্র টের পাওয়া যায়। এই বক্তৃতা এখনো প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ।

দুর্নীতির ধারা

টেবিল-১ : ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান

বছর	স্কোর	নিচ থেকে অবস্থান	সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা	বছর	স্কোর	নিচ থেকে অবস্থান	সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা
২০০১	০.৪	১	৯১	২০১১	২.৭	১৩	১৮৩
২০০২	১.২	১	১০২	২০১২*	২৬*	১৩	১৭৬
২০০৩	১.৩	১	১৩৩	২০১৩	২৭	১৬	১৭৭
২০০৪	১.৫	১	১৪৬	২০১৪	২৫	১৪	১৭৫
২০০৫	১.৭	১	১৫৯	২০১৫	২৫	১৩	১৬৮
২০০৬	২.০	৩	১৬৩	২০১৬	২৬	১৫	১৭৫
২০০৭	২.০	৭	১৮০	২০১৭	২৮	১৭	১৮০
২০০৮	২.১	১০	১৮০	২০১৮	২৬	১৩	১৮০
২০০৯	২.৪	১৩	১৮০	২০১৯	২৬	১৪	১৮০
২০১০	২.৪	১২	১৭৮				

২০০১-২০১০ সাল পর্যন্ত ০-১০ স্কেলে পরিমাপ করা হয়েছে; ২০১২ সাল থেকে ০-১০০ স্কেলে পরিমাপ করা হয়। সূত্র : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

লাগামহীন দুর্নীতির রাশ টেনে ধরার দোহাই দিয়ে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সামরিক সরকার দেশ চালিয়েছে। তবে এই সময়েও দুর্নীতি কমেনি, বরং বেড়েই চলে। এমনকি ১৯৯১-পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর আমলেও দুর্নীতির ধারা অব্যাহত থেকেছে। ২০০১ সাল থেকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বৈশ্বিক দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রকাশ করে আসছে। সেখানে দেখা যায়, ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ টানা পাঁচবার সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা পেয়েছে।

২০০৭ সাল থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অভিযান দৃশ্যমান হয়। তখন দুর্নীতির ধারণাসূচকে দেশটির অবস্থান ইতিবাচক হওয়া শুরু হয়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের আগে নির্দিষ্ট করে দুর্নীতি বন্ধ করাকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা দেয়। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর দলটি বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করে। তবে দুর্নীতির তালিকায় তলানিতে থাকা যে ২০টি দেশ, এখনো বাংলাদেশ এই তালিকার মধ্যেই আছে। এ অবস্থান বদলের ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো প্রচেষ্টাও চোখে পড়ে না। সামাজিক সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় সম্মানজনক অবস্থান থাকার বিপরীতে দুর্নীতির বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ২০১২-১৫ সময়কালে দুর্নীতির ধারণা সূচকে নেপাল, পাকিস্তান ও ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নিচে চলে যায়।

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি

স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতিও সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সামগ্রিক দুর্নীতির ধারণার প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। ২০১৫ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) জাতীয় খানা জরিপের ফলাফলে দেখা যায় ৬৭.৮ শতাংশ পরিবার সামাজিক সেবা পেতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে অংশ নেওয়া ৮৬.১ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছে, যার মধ্যে ৩৭.৫ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। টিআইবির তথ্যমতে, একটি পরিবার অনানুষ্ঠানিকভাবে গড়পড়তা ১৯৬ টাকা ব্যয় করে স্বাস্থ্যসেবা পেতে। হিসাব করে দেখা গেছে, সারা দেশে পরিবারগুলোর ৫৭ কোটি টাকা গচ্চা গেছে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির কারণে। মোটামুটি হিসাব করে অস্বাভাবিক ফলাফল পাওয়া যায়, যেখানে স্বাস্থ্যসেবা পেতে প্রতি পাঁচটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার কোনো না কোনো অনিয়মের শিকার হয়েছে।

টিআইবি প্রতিবেদনে আরও দেখা যায় যে গরিব পরিবারগুলো উচ্চ আয়ের পরিবারগুলোর চেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহায় দুর্নীতির ফলে। সুতরাং বিষয়টি শুধু দুর্নীতির কারণে টাকা গচ্চা যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির কারণে জনগণের, বিশেষ করে গরিব মানুষের অধিকারও খর্ব হচ্ছে।

কোনো একটি দেশের স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির বিষয়টি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার জন্য বেশ কিছু কাঠামো রয়েছে। অনেকেই স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির বিশ্লেষণ করতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকে ব্যাহত করে, এ রকম তিন ধরনের অনিয়ম চিহ্নিত করেছেন, যথা অনানুষ্ঠানিক অর্থ প্রদান, ঘুষ ও কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি। আমরা এই নিবন্ধে ন্যায্যতা ও অধিকারের আলোকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির বিষয়টি ভিন্ন রকমের তিনটি ধারায় ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি।

১. ছোটখাটো দুর্নীতি, যেখানে গরিব মানুষেরা বেশি দুর্ভোগ পোহায় এবং তাদের মর্যাদা ও মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয় (যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবা);
২. দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে আর্থসামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সবাই দুর্নীতির শিকার হয় (যেমন ওষুধ, রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা উপকরণ);
৩. রাজনৈতিক দুর্নীতি, যেখানে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী লোক ব্যাপক আকারে টাকা বানিয়ে নেন (যেমন জিনিসপত্র ক্রয়, সেমিনার সিম্পোজিয়াম আয়োজন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাসফর, কনসালট্যান্সি প্রদান, চিকিৎসাবিষয়ক উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি)

স্বাস্থ্য খাতের খুদে দুর্নীতি

বাংলাদেশে দুর্নীতি বলতে মানুষ বুঝে থাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে টাকা প্রদান করা বা ঘুষ দেওয়া। সেখানে অন্যান্য অনিয়ম যেমন ক্ষমতা বা নির্দিষ্ট কোনো পদ বা চেয়ারের অপব্যবহার দুর্নীতি হিসেবে দেখা না-ও হতে পারে। বরং দুর্নীতির সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু অতিরিক্ত টাকা প্রদানই বোঝানো হয়। তবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতির যে সংজ্ঞা দিয়ে থাকে, সেখানে অর্পিত কোনো ক্ষমতা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত হবে। এই সংজ্ঞায় দুর্নীতি নামক রোগের গভীরতা, পরিধি ও প্রকৃত প্রভাব ধরা পড়ে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিশ্লেষণে এই সংজ্ঞা তাৎপর্যপূর্ণ। তবে দুর্নীতি নিয়ে কাজ করা প্রখ্যাত গবেষকেরা ব্যক্তিগত লাভের পাশাপাশি রাজনৈতিক লাভকেও দুর্নীতির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং ক্ষমতার ব্যবহারের পাশাপাশি অপব্যবহার ও কুব্যবহারকেও বুঝিয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে আমরা জোর দিতে চাই যে বিষয়ের ওপর, তা হলো, টিআইবির প্রতিবেদন অনুযায়ী যে ১৬.৭ শতাংশ পরিবার কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ঘুষ অথবা অনানুষ্ঠানিক অর্থ দিতে হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে সরকার বিনা মূল্যে ওষুধের সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়েছে। তারপরও ১৩.৮ শতাংশ পরিবার ওষুধ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের

শিকার হয়েছে। এসব অনিয়মের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় ওষুধ না থাকা, থাকার পরও ওষুধ না দেওয়া বা প্রয়োজনীয় পরিমাণমতো না দেওয়া এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থ প্রদান ছাড়া ওষুধ বিতরণ না করা। ৬.২ শতাংশের ক্ষেত্রে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা ক্লিনিক সুপারিশ করা হয়েছে; প্রয়োজনের সময় ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে দায়িত্বরত অন্য ব্যক্তিদের পায়নি ৪.৮ শতাংশ; ২.১ শতাংশের ক্ষেত্রে ডাক্তার দেখানোর সময় তাদের সিরিয়াল ভঙ্গ করা হয়েছে; এবং ১.২ শতাংশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গ করা হয়েছে, কারণ, ডাক্তার দেখানোর সময় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

১৬.৭ শতাংশ, যারা দুর্নীতির শিকার হয়ে ঘুষ দিয়েছে, শুধু তাদের প্রতি মনোযোগ দিলে অন্যান্য অনৈতিক কাজের মাধ্যমে নিহিত ক্ষমতার ব্যাপক অপব্যবহারের বিষয়টি বাদ পড়ে যায়। টিআইবির গবেষণায় আমরা দেখলাম যে এসব অপব্যবহারের ফলে শুধু ঘুষ দেওয়ার বাইরেও আরও বিভিন্নভাবে মানুষের অধিকার খর্ব হতে পারে। সময় ব্যয়, মর্যাদা খর্ব হওয়া, হাসপাতালের বাইরে থেকে ওষুধ কেনার ফলে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় ইত্যাদির মতো অনিয়মের অভিজ্ঞতা আমলে না নিলে দেখা যাবে আমরা দুর্নীতির একটি সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছি। এর ফলে ভুক্তভোগীর সত্যিকার ক্ষতির আওতা এবং ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো বাদ পড়ে যাবে। এসব ক্ষতি টাকার হিসাবে দেখানোর এবং এগুলোকে দুর্নীতি হিসেবে বিবেচনা করার শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে।

২০১৮ সালের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক বুলেটিনের হিসাব অনুযায়ী ২০১৭ সালে বাংলাদেশে ১৬ হাজার ৩৬টি সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বহির্বিভাগ ও জরুরি বিভাগ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ১৪ কোটি রোগী দেখা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় তিন কোটির মতো রোগী দেখা হয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোয়, এবং এক কোটির বেশি দেখা হয়েছে মেডিকেল কলেজগুলোয়—বহির্বিভাগ, জরুরি সেবা ও ভর্তি হওয়া রোগী মিলিয়ে। ১৩ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রায় ৮ কোটি রোগী দেখা হয়েছে। একটি মেডিকেল কলেজে গড়পড়তা দৈনিক ১৭ হাজারের বেশি রোগীর সেবা দেওয়া হয়, যেখানে একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা দেওয়া হয় ২০০ জন রোগীর। দুর্নীতির ক্ষেত্রে টিআইবির প্রতিবেদনে দেখা যায়, বেশির ভাগ মানুষ (৩৮ শতাংশ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোয় সেবা নিতে গিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। মেডিকেল কলেজগুলোর ক্ষেত্রে এই হার ৩৫.১ শতাংশ। উচ্চতর প্রতিষ্ঠান ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যৌথভাবে এই হার ৩৬.৮ শতাংশ। এসব তথ্য-উপাত্ত স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা বুঝতে সাহায্য করবে।

২০১৭ সালে বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রায় ৬০ লাখ রোগী ভর্তি হয়েছিল, এর মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয় প্রায়

২৩ লাখ আর জেলা হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হয়েছিল প্রায় ১৯ লাখ রোগী। ২০১৩ সালের এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী জেলা হাসপাতালে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভর্তি হওয়া রোগী এবং উপজেলা হাসপাতালে এক-পঞ্চমাংশ ভর্তি হওয়া রোগী হাসপাতালে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেছে। প্রায় ৮ শতাংশ রোগী ভর্তি অবস্থায় ছোটখাটো সেবা নেওয়ার জন্য তিনবার করে অনানুষ্ঠানিক অর্থ প্রদান করেছে । এই গবেষণার সঙ্গে সাম্প্রতিক অতীতে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ও অনুপাত দিয়ে অঙ্ক করলে দেখা যাবে যে স্বাস্থ্য খাতে সেবা নেওয়ার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপুল পরিমাণ অর্থ অনানুষ্ঠানিকভাবে খরচ হয়। টিআইবির খানা জরিপের সঙ্গে এই সংখ্যাগুলো মেলালে দেখা যাবে, মেডিকেল কলেজগুলোয় ঘুষের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি (২৮৩ টাকা) আর কমিউনিটি ক্লিনিকে ঘুষের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে কম (৩১ টাকা)। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে কমিউনিটি ক্লিনিকেই সবচেয়ে বেশি রোগী দেখা হয়ে থাকে। যেমন ৮ কোটি রোগী সেবা নিয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোয় এবং সেখানে বেশির ভাগ গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার সেবা নিয়ে থাকে।

দেশের সবচেয়ে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র দৈনিক *প্রথম আলো* ২০১৬ সালের শুরুর দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপর বেশ কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায়, হাসপাতালের ওষুধ পাচার করা হয়। ট্যাক্সি ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিয়ন্ত্রণ করে কর্মচারী সমিতি। এমনকি লাশ পরিবহনও তাদের নিয়ন্ত্রণে। হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেতেও ঘুষ দিতে হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপর টিআইবির বিশেষ প্রতিবেদনেও (নভেম্বর ২০১৪) একই রকম ফলাফল পাওয়া যায়। কিছু ইউনিটে ডাক্তার অনুপস্থিত; ডাক্তারদের কেউ কেউ রোগীদের বলেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত চেম্বারে দেখাতে; রোগী দেখার সময় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন; নির্দিষ্ট বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগ নির্ণয় করতে ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন, প্রয়োজনের সময় সহায়তাকারী উপস্থিত ছিলেন না এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ ও অন্যান্য সামগ্রী আত্মসাৎ করা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে সহায়তাকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিতে হয়েছে, সেগুলো হলো : হাসপাতালের ফ্লোরে শয্যা পেতে; নবজাতক দেখতে যেতে বা নবজাতকের রিলিজ নিতে; ট্রলি ব্যবহার করতে; রক্ত পরীক্ষা ও এক্স-রে দ্রুত করানোর জন্য; এমআরই স্ক্যানের জন্য লাইন ডিঙিয়ে যেতে; ক্যাথিটার বা মূত্রনিষ্কাশন যন্ত্র লাগাতে; গেট পাস নিতে ইত্যাদি। টিআইবি প্রতিবেদনে প্রতিটি সেবায় ঘুষের হারও দেওয়া হয়েছিল।

এখানে যে বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সেবাগ্রহীতাদের বেশির ভাগই নিম্ন আয়ের মানুষ। দেশের

প্রতিষ্ঠাকালীন চেতনার একটি ছিল স্বাস্থ্যসেবা তৃণমূল পর্যায়েও সহজলভ্য হবে। তাই স্বাস্থ্যসেবায় লাগামহীন দুর্নীতি ও অনিয়ম গরিব মানুষের অধিকার এবং মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা হিসেবে যে সামাজিকভাবে ন্যায্য সমাজের দৃশ্যকল্প ছিল, তা লঙ্ঘন করে।

স্বাস্থ্যসেবায় এ ধরনের খুদে দুর্নীতির মূল কারণ নিয়ে কোনো পদ্ধতিগত গবেষণা হয়নি। বৈশ্বিকভাবে করা কিছু গবেষণায় দেখা যায় যে সরকারি কর্মীদের নিম্ন বেতনের কারণে তাঁদের প্রেরণা কম থাকে। এটা বাংলাদেশের জন্যও প্রযোজ্য। তবে, বাংলাদেশ সরকার সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন ১০০ শতাংশ বাড়িয়েছে, যা তুলনাবিহীন। সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীরা ক্রমাগত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করেছে। তাদের আশা ছিল বেতন বাড়লে দুর্নীতি কমবে। তবে দুর্নীতি হ্রাসে সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের এমন তাৎপর্যপূর্ণ বেতন বৃদ্ধির প্রভাব আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না।

স্বাস্থ্য খাতের এই খুদে দুর্নীতিকে অনেকেই এই ভেবে উপেক্ষা করেন যে এগুলো নিম্নশ্রেণির কর্মচারীদের যোগসাজশে হয়ে থাকে এবং সেবার বিনিময়ে বকশিশ দেওয়া তেমন কোনো অপরাধের বিষয় নয়। স্বাস্থ্য খাতের প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক দুর্নীতির ব্যাপকতা এতই প্রকট এবং তাতে যে পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুণ্ঠন হচ্ছে, তার তুলনায় এগুলো নগণ্য বিষয়। আমাদের প্রতিযুক্তি হলো, দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তি মৌলিক অধিকারের এবং মানবাধিকারের বিষয়। এতে করে রাজনৈতিক সরকারের ভাবমূর্তি তিলে তিলে প্রতিনিয়ত অবক্ষয়িত হয় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। দুদকের পাশাপাশি মানবাধিকার কমিশনের এ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখা এবং সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে মানবাধিকার কমিশন যেভাবে অবসরপ্রাপ্ত আমলা-অধ্যুষিত হয়ে কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, তাতে খুব আশাবাদী হওয়া না গেলেও মানবাধিকার কমিশনের কাছে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। বিষয়টি তাদের ভাবনায় এলে দরিদ্র জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ হতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বলতে আমরা প্রাইভেট সেক্টর তথা ব্যক্তি খাতে প্রতিষ্ঠিত ওষুধশিল্প, প্রাইভেট ক্লিনিক, হাসপাতাল, রোগনির্ণয় কেন্দ্র কর্তৃক নানা প্রকার অনিয়ম, নীতির ব্যত্যয়, অর্থসম্পদের অপ ও কুব্যবহারকে বোঝাচ্ছি, যার কারণে স্বাস্থ্যসেবা দানকারী একটি শ্রেণি কমিশন-বাণিজ্য ও নানা প্রকার অনৈতিক উপঢৌকন গ্রহণের মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে এবং ঘুরেফিরে জনগণের গড়পড়তা স্বাস্থ্য

খরচ বেড়ে যাচ্ছে ও সংসারের অন্যত্র থেকে তা বহন করতে হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের এই সব দুর্নীতি তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ প্রশিক্ষণ, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে যে এসব দুর্নীতিকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত এবং প্রতিষ্ঠিত করাও এখন দুরূহ ব্যাপার। ঠিক একইভাবে এসব খাতের স্বল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের কারণে ওষুধশিল্প এবং প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং রোগনির্ণয় প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি জনগণের কাছে ভরসার নয়, বরং দুর্নীতির এক প্রতিচ্ছবি।

ওষুধ

১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বার্ষিক প্রায় ৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, দুর্নীতি, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, অর্থনৈতিক সংস্কারের ধীর বাস্তবায়ন এবং ২০০৮-০৯ সালে বৈশ্বিক আর্থিক সংকট ও মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতির এই বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১ হাজার ৩৮৫ মার্কিন ডলার। বছরের পর বছর স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় জিডিপি শতাংশে ছিল খুবই কম—১ শতাংশের মতো। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় ক্রমাগত বেড়েছে। বর্তমানে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ২৬ মার্কিন ডলার। যেহেতু স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দ ছিল কম, তাই সার্বিক ব্যয় নির্বাহ হয়েছে মানুষের পকেট থেকে। পকেট থেকে স্বাস্থ্যব্যয় মেটানোর হার বাংলাদেশে এই অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ (৬৩ শতাংশ)।

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির একটি অন্যতম কারণ হলো ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে মানুষের পকেট থেকে ব্যয় হয় ৬৬ শতাংশ। বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে ওষুধ মূলত বিক্রি করে ২ দশমিক ৫ লাখ অনানুষ্ঠানিক খাতের ওষুধ বিক্রেতা। এরাই হলো বাংলাদেশের ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ওষুধশিল্পের খুচরা বিক্রির মূল চ্যানেল। ২০১০ সালে 'বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ' নামের এক নাগরিক সংগঠন স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায় পলি-ফার্মেসি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ এক প্রেসক্রিপশনেই অনেকগুলো ওষুধের নির্দেশ দেওয়া থাকে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধায় অপরিহার্য ওষুধের ব্যবহার কমছে, অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বাড়ছে এবং ফার্মেসি কর্তৃক নির্দেশিত ওষুধের বেশির ভাগই অ্যান্টিবায়োটিক (৬০ শতাংশ)। অ্যান্টিবায়োটিকের বাছবিচারহীন ব্যবহার এবং অসমাপ্ত কোর্সের কারণে বাংলাদেশে এই ওষুধের কার্যকারিতা কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি রোগজীবাণু ধীরে ধীরে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করছে। বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের কার্যকারণভিত্তিক হাল অবস্থা নিচের রেখচিত্রে দেখানো হলো।

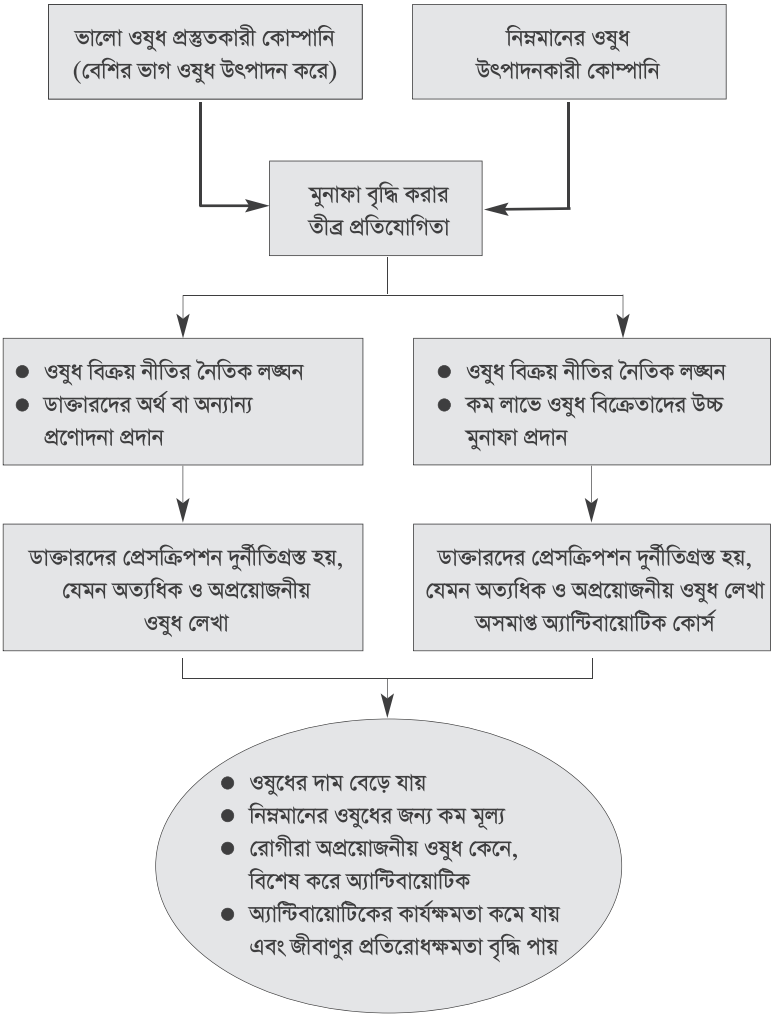

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, অপরিহার্য ওষুধের দামে নৈরাজ্য বিরাজমান। ২০ হাজারেরও বেশি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের (ওষুধ বিক্রেতা প্রতিনিধি) মাধ্যমে আগ্রাসী ও অনৈতিক মার্কেটিং এবং অনিয়ন্ত্রিত সেবা প্রদান বিধানের সঙ্গে রয়েছে নাগরিকদের সচেতনতার অভাব। ফলে বাড়ছে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়। ২০১১ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আড়াই লাখ 'অদক্ষ' অনানুষ্ঠানিক ওষুধ বিক্রেতাদের দেখানো হয়েছে ওষুধপ্রাপ্তির প্রথম স্থান হিসেবে,

কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। এসব ওষুধ বিক্রেতা অনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে মূলত নিম্নমানের ওষুধ বিক্রি করে থাকে। এর ফলে ওষুধ বিক্রয় নীতি লঙ্ঘিত হয়। অন্য কথায় বললে, বাংলাদেশের মানুষ ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে। আর গরিব জনগোষ্ঠী সামঞ্জস্যহীনভাবে বেশি দামে নিম্নমানের ওষুধ কিনতে বাধ্য হয়।

এই সমস্যার শিকড় খুব গভীরে। চিকিৎসকেরা ওষুধসংক্রান্ত তথ্যের জন্য এক অর্থে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের ওপর নির্ভর করে। পণ্যের এসব তথ্যে কম সতর্কতা, অল্প পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, ওষুধ সম্পর্কে অল্প সতর্কবার্তা এবং অনুমোদিত নির্দেশনার চেয়ে বেশি পরিমাণ থাকতে পারে। এর পাশাপাশি, প্রমোশনাল বা প্রচারমূলক উপহার এবং নির্দিষ্ট কোম্পানির ওষুধ কেনার জন্য ডাক্তারদের প্ররোচিত করতে খরচ দেওয়া হয়, যা ঘুরেফিরে বহন করতে হয় রোগীদের। সমস্যার মাত্রা এতটাই যে উপহার হিসেবে মুদিদোকানের পণ্য থেকে বিদেশ ভ্রমণের প্যাকেজ দেওয়া হয়ে থাকে। একজন ডাক্তারের ভাষ্যমতে, 'তারা আমাদের কী দেয় না, তা বলা কঠিন।' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা ডাক্তারের মূল্যবান সময় খেয়ে ফেলে, যা ডাক্তাররা রোগীদের পেছনে ব্যয় করতে পারতেন। বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালে আসা দরিদ্র রোগীদের মূল্যবান সময় এতে নষ্ট হয়। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের সামনেই দরিদ্র রোগীদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসংক্রান্ত কথা বলা হয় এবং ব্যক্তিগত প্রশ্নও করা হয়, যা নারী রোগীদের জন্য বিব্রতকর হতে পারে। এটা এখন সবাই জানে যে ওষুধ কোম্পানিগুলো ডাক্তারদের নগদ অর্থ, চেক থেকে শুরু করে বাজারসদাই, গাড়ির ব্যবস্থা, সপরিবার বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে। মজার ব্যাপার হলো, ১৬টি ওষুধ কোম্পানির নাম সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে তালিকাভুক্ত এবং স্টক মার্কেটে নিয়মিত তাদের শেয়ার কেনাবেচা হয়। কিন্তু ওষুধ বিক্রির নিয়মনীতি অনুসারে তাদের অডিট বা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কোনো ধরনের অনিয়মের কথা উল্লেখ থাকে না। এ জন্য কোনো অডিট ফার্মকে আজ পর্যন্ত ঔষধ প্রশাসন, স্টক এক্সচেঞ্জ, সিকিউরিটিজ কমিশন, দুদক বা তাদের নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠান বা কারও কাছে কোনো জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হয়নি; এমনকি কোনো বার্ষিক সাধারণ সভায় কোনো সচেতন শেয়ারহোল্ডারের কাছেও নয়।

ওষুধশিল্পের নাজুক শাসনের অন্যতম মূল কারণ আসলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতার অভাব। ২ হাজার ৪০০টি ব্র্যান্ডের ১ হাজার ১০০ সাধারণ ওষুধ পরীক্ষার জন্য মাত্র ২টি ল্যাবরেটরি আছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কমিটির সদস্য পদের মধ্যে প্রায়ই স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সাংসদ হয়েও যখন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কমিটির মিটিংয়ে কেউ আসেন কিংবা ওষুধ কোম্পানির মালিক বা এমডি হয়েও স্বাস্থ্য

মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য পদে সমাসীন হন, তখন স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকটভাবে দেখা দেয় এবং ঔষধ প্রশাসনও অসহায় বোধ করে। সদস্যপদ নির্ধারণের জন্য কোনো স্বচ্ছ মানদণ্ডও নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ওষুধশিল্প খাতে সুশাসনের মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সক্ষমতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। এর প্রমাণ পাওয়া যায় নিচের ঘটনা থেকে :

'বিষাক্ত' প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে ২৮ শিশুর মৃত্যু : অভিযুক্তরা খালাস

রিড ফার্মাসিউটিক্যালের বিষাক্ত প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে ২৮ শিশুর মৃত্যুর ঘটনার ৭ বছর পর ২৮ নভেম্বর ২০১৬ সালে আদালত ওষুধ কোম্পানির সব অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে খালাস দিয়েছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রিড ফার্মার টেমসেট সিরাপের একটি চালানে বিষাক্ত উপাদান থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। ২০০৯ সালে আনুষ্ঠানিক তদন্ত কমিটির বরাত দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। প্রপেলিন গ্লাইকোলের পরিবর্তে সস্তা ও বিষাক্ত ডাই-ইথিলিন গ্লাইকোল এসব প্যারাসিটামল সিরাপে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে তদন্ত কমিটির অনুসন্ধানে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে ডাই-ইথিলিন গ্লাইকোল চামড়া ও রাবারশিল্পেও ব্যবহার করা হয়। প্রমাণ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে নিয়ম না মানার কথা উল্লেখ করে আদালত খালাস দেওয়ার আদেশ দেন। আদালতে পেশকৃত প্রমাণ রিড ফার্মার কারখানা থেকে সংগ্রহ না করে শিশু হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর ফলে রিড ফার্মা যে এই বিষাক্ত উপাদান যুক্ত করেছে, সে বিষয় নির্দিষ্ট করে প্রমাণ করা কঠিন। সংগৃহীত প্রমাণের উপাদান চার জায়গায় থাকার কথা : বাদী, বিবাদীর আইনজীবী, ল্যাবরেটরি ও আদালত। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। সঠিকভাবে প্রমাণ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও মামলার বাদীর দিক থেকে অবহেলা ও অদক্ষতা দেখতে পেয়েছেন আদালত। সৌভাগ্যক্রমে, এ ঘটনার কিছুদিন পরই ওষুধ কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

দীর্ঘ পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার পর ২০১৬ সালের শেষভাগে জাতীয় ওষুধ নীতির সংশোধিত খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রিপরিষদ। সংশোধিত এই নীতিতে ওপরে উল্লিখিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে। সংশোধিত জাতীয় ওষুধ নীতিতে বিশেষ করে ব্যবস্থাপত্রের বাইরে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি নিষিদ্ধ করা এবং অনানুষ্ঠানিক ওষুধ বিক্রেতাদের জন্য সুপারিশ রয়েছে।

কমিশন-বাণিজ্য

'ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্ট অব বাংলাদেশের' সর্বশেষ (২০১৬) প্রতিবেদন অনুযায়ী মানুষের পকেট থেকে স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৮.৬৪ শতাংশ ব্যয় হয় রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশে এটা সর্বজনবিদিত যে ডাক্তার দেখাতে গেলেই, এমনকি অনানুষ্ঠানিক ওষুধ বিক্রেতার কাছে গেলেও নির্দিষ্ট বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে বলা হয়। এর বিনিময়ে ডাক্তার কিংবা সুপারিশকারী একটা নির্দিষ্ট কমিশন পাবে। আর সেই কমিশন আসে মূলত রোগনির্ণয়ের মোট খরচের অংশ থেকেই। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই হার ৪০ শতাংশ। ফলে একজন ডাক্তারের রোগী দেখার ফি যদি হয় ৫০০ টাকা, তাহলে ২ হাজার টাকার কোনো পরীক্ষা করতে পাঠালে সেই ডাক্তার সঙ্গে আরও ৮০০ টাকা বাড়তি কমিশন পাচ্ছে। এর ফলে অতিরিক্ত প্রেসক্রিপশন এবং অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। অভিযোগ আছে যে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো এই কমিশন দেওয়ার জন্য ডাক্তারদের বা সুপারিশকারীর নাম নির্ভুলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। নিয়মিত বিরতিতে এই কমিশন দেওয়ার জন্য আলাদা হিসাবের বই আছে তাদের। ফলে রোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়। কারণ, ল্যাবরেটরিগুলোর খরচের টাকা থেকেই ডাক্তারদের টাকা দেওয়া হয়, যা অত্যন্ত অনৈতিক ও দুর্নীতিপরায়ণ চর্চা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মন্তব্য করেছিলেন, যদি ডাক্তাররা ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো থেকে কমিশন নেওয়া বন্ধ করেন, তাহলে রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। এই মন্তব্যের ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিরাট ঝড় ওঠে, কিন্তু সাবেক উপাচার্য তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করেননি। বেশ কিছু সংবাদপত্র এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোয় খোলাখুলিভাবে এই সমস্যার ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা হয়। তবে এখন পর্যন্ত এই সমস্যা পর্যালোচনার জন্য কোনো গবেষণা হয়নি।

টিআইবির এক গবেষণায় দেখা যায়, ল্যাবরেটরিভেদে চিকিৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের হেরফের হয়। যেসব ল্যাবের প্রাতিষ্ঠানিক নিষ্ঠা আছে, তারা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক কম টাকা নেয়। তবে মূল্যের যে হেরফের হয়, তা প্রমাণ করা কঠিন। এর কারণ ডাক্তারদের কমিশন নেওয়া। একইভাবে প্রেসক্রিপশন নিরীক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি না থাকায় এটা বলা কঠিন, আসলে কত শতাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অকারণে করতে বলা হয়েছে, অথবা কী পরিমাণ টাকা রোগীরা ডাক্তারের কমিশনের পেছনে ব্যয় করছে।

চিকিৎসার উপকরণ আরেক সমস্যা। এটা এখন ওপেন সিক্রেট। এ ব্যাপারে ডাক্তারদের পরামর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া রোগীদের আর কোনো উপায় থাকে না। স্টেন্ট, পেসমেকার, ইমপ্লান্ট, লেন্স ও অন্যান্য চিকিৎসা উপকরণ নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ডাক্তারের পরামর্শমতে রোগীরা নিয়মিত কিনে থাকে। প্রায়ই, হাসপাতাল বা ডাক্তাররা এসব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে থাকে এবং

এরপর রোগীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা বাজারদর যাচাই করার কোনো সুযোগই পান না। ফলে অন্ধভাবে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন।

যদি কারও ইন্টারনেট ব্যবহারের মোটামুটি দক্ষতা থাকে, তাহলে কর ও মূসক যুক্ত করার পর আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে এসব উপকরণের দর তুলনা করে দেখতে পারে। সেখানে দেখা যাবে রোগীদের কাছ থেকে এখানে কয়েক গুণ বেশি মূল্য রাখা হয়। সাধারণত কমিশন যুক্ত হওয়া এবং মধ্যস্থতাকারী হাসপাতালগুলোর বাড়তি মুনাফার কারণে এসব যন্ত্রপাতির মূল্য বেশি হয়ে থাকে। চিকিৎসা সরঞ্জামাদির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচরাচর প্রশ্নও করা যায় না, যেটা রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে করা যেত। স্বাস্থ্য খাতে এ ধরনের লুক্কায়িত মূল্য এবং 'কমিশন' থেকে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির সবচেয়ে খারাপ রূপ দেখা যায়। পদ্ধতিগতভাবে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা দুর্বল করে দেওয়া এবং রোগী ও তাদের পরিবারের বিপন্ন অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করার চিত্রও এখান থেকে পাওয়া যায়। আমরা আবারও বলছি যে এসব ঘটনা আমরা নিয়েছি পত্রিকার প্রতিবেদন ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর টক শো অনুষ্ঠানে খোলাখুলি আলোচনা থেকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) গোয়েন্দা শাখা অথবা দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো সংস্থা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে পারে এবং রোগীদের পক্ষে অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে।

মেডিকেল শিক্ষায় নৈতিকতার শিক্ষা এবং রোল মডেল ডাক্তার বা শিক্ষকদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ—উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শিক অবস্থানের তুলনায় বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ঔষধ প্রশাসনেরও দক্ষতা এবং সক্ষমতা উভয়ই দুর্বল। তাই ওষুধশিল্প ও কমিশন-বাণিজ্যের যথেচ্ছাচার এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি অচিরেই বন্ধ করা যাবে—এমন আশা করা উচিত হবে না। তবে দীর্ঘ মেয়াদে ওষুধশিল্পের শীর্ষ নেতারা এবং চিকিৎসকসমাজের শীর্ষ নেতৃত্ব যদি রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল ও ঔষধ প্রশাসন তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হ্রাসে কিছুটা সফলতা আসবে। একই সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক খাতের আড়াই লক্ষাধিক ওষুধের দোকানি এবং অনানুষ্ঠানিক চিকিৎসাদাতাদের পর্যায়ক্রমিক মান নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যনীতিতে সরকারের অবস্থান ও দিকনির্দেশনা সুস্পষ্ট করতে হবে। সর্বোপরি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য খাতের তথ্য সরবরাহে স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে।

রাজনৈতিক দুর্নীতি

রাজনৈতিক দুর্নীতির ধারণায় আমরা বলেছি যে এ জাতীয় দুর্নীতিতে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী বা রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে কিংবা রাজনৈতিক সদিচ্ছার

অভাবকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে মুষ্টিমেয় লোক ব্যাপক আকারে টাকা বানিয়ে নেয়। এই দুর্নীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এতে সাধারণ জনগণ কিছুই টের পায় না এবং ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মিডিয়া তা ফলাও করে প্রচার না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ এসব সম্পর্কে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু এসব দুর্নীতি জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের টাকা সরকারের কোষাগার থেকে হরিলুট করে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি বিশ্বব্যাংক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ করে যেসব উন্নয়ন প্রকল্প স্বাস্থ্য খাতে নিচ্ছে, সেখান থেকেও দুর্নীতি করে অর্থ সরিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অহেতুক ঋণের বোঝা বাড়িয়ে যাচ্ছে এসব মুষ্টিমেয় দুর্নীতিবাজ। এসব দুর্নীতির চরম খারাপ দিক হলো দুর্নীতির অর্থ বিদেশে পাচার। খুদে দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ফলে যে অর্থপ্রবাহ ও অর্থচক্র তৈরি হয়, তা মূলত দেশের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে; নিম্ন আয়ের সরকারি কর্মচারী দরিদ্র রোগীর স্ট্রেচার ঠেলে দিয়ে বা প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তির দালালি করে যে দুর্নীতি করে, যে আয় করে, তা সে দেশেই ভোগ করে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতেও শীর্ষস্থানীয় ডাক্তারদের বিদেশভ্রমণ বাবদ বিদেশি ব্যয় বাদ দিলে বেশির ভাগ অর্থ দেশেই ব্যয় করা হয়। রাজনৈতিক দুর্নীতিতে সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ খুদে দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সম্মিলিত পরিমাণের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি হবে বলে অনুমান করা হয়। রাজনৈতিক দুর্নীতির বেশির ভাগ অর্থই, বিশেষ করে ক্রয়াদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যায় বলে দেশের কোনো কাজে তো লাগেই না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঋণের বোঝা তৈরি করে। এ জন্যই এই দুর্নীতি হলো নিকৃষ্টতম দুর্নীতি। আমাদের বিশ্লেষণে এই দুর্নীতি মূলত তিনটি ধারায় চলে।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা : নিয়োগ-বাণিজ্য, পদায়ন ও পদোন্নতি

নতুন নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি—মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার এই তিন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দুর্নীতির ইতিহাস অনেক পুরোনো। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একে দেখা হয় তদবির বা সুপারিশ হিসেবে। আর্থিক লেনদেনবিহীন এসব সুপারিশকে আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ মনে হলেও তদবিরভিত্তিক নিয়োগ সুস্থ প্রতিযোগিতার সব সম্ভাবনাকে তিরোহিত করে যোগ্য প্রার্থীকে অধিকারবঞ্চিত করে। একজন অযোগ্য প্রার্থীকে তদবিরের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া মানেই জনগণকে ৩০ থেকে ৩৫ বছর নিম্নমানের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং দুর্নীতির পরম্পরা অব্যাহত রাখা। ফলে একটি তদবিরভিত্তিক নিয়োগ মানেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একজাতীয় দীর্ঘমেয়াদি অপরাধ সংঘটিত হওয়া।

২০০৯ সালে সরকার এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রতি ৬ হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি ক্লিনিক হিসেবে দেশের ১৩ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক

পুনরুজ্জীবিত করতে প্রায় সমপরিমাণ 'কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার' নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রায় একই সময়ে দেশব্যাপী ১ হাজার ৮০০ স্বাস্থ্য সহকারী, ৩ হাজার ৫০০ পরিবারকল্যাণ সহকারী এবং ৬ হাজার ডাক্তার নিয়োগ দেওয়া হয়। ডাক্তারদের নিয়োগ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হওয়ায় আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ তীব্রভাবে পাওয়া যায়নি। তবে অন্যান্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে গড় হারে আর্থিক লেনদেন হয়েছে, তাতে অত্যন্ত রক্ষণশীল হিসেবেও সারা দেশে ৫০০ থেকে ৭০০ কোটি টাকার নিয়োগ-বাণিজ্য হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী এসব নিয়োগ ছিল রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত এবং রাজনৈতিক প্রবাহের প্রায় সব স্তরেই ঘুষের ভাগ পৌঁছেছিল।

একটা সাধারণ ব্যাপার লক্ষণীয় যে পদোন্নতি ও পছন্দনীয় জায়গায় বদলি হওয়ার বিষয়টি পেন্ডুলামের মতো বড় দুই রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে ঘুরপাক খায়। বিগত কিছু বছরে নির্দিষ্ট কিছু পদে ব্যাপকহারে বদলি ও পদোন্নতি হয়েছে এমন কর্মকর্তাদের, যাঁরা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হিসেবে পরিচিত। শুধু তা-ই নয়, কেউ যদি শিক্ষাজীবনেও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হয়ে থাকেন, তাহলে দূরবর্তী গ্রামীণ হাসপাতালের বদলে বড় শহরে বা তার আশপাশে ভালো পদায়ন পাওয়া যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হলো রাজনৈতিক পদায়ন ও পদোন্নতির আদর্শ উদাহরণ।

চিকিৎসাশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তি, লেখাপড়ার মান এবং স্নাতকোত্তর চিকিৎসাশিক্ষায় বাংলাদেশের সুনাম ছিল। এর পেছনে নিবেদিতপ্রাণ কিছু অধ্যাপক ও আদর্শ শিক্ষকের অবদান ছিল অপরিসীম। কিন্তু প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তির অতি উচ্চ ফি নির্ধারণ ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসকদের সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে পদোন্নতির এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিস পসারের সুযোগ চিকিৎসাশিক্ষা খাতে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটায়। রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে স্নাতকোত্তর চিকিৎসাশিক্ষায় চিরকুট দিয়ে ভর্তি ও পাস করার সুযোগ স্নাতকোত্তর চিকিৎসাশিক্ষার মানে ধস নামায়। একই সঙ্গে মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং কোচিং-বাণিজ্যের অবাধ বিস্তার চিকিৎসাশিক্ষা খাতে দুর্নীতির প্রবেশদ্বারে পরিণত হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কর্মকর্তাদের প্রশ্নপত্র ফাঁস ও দুর্নীতি অস্বীকার করার সংস্কৃতি দুর্নীতি দমনের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। স্নাতকোত্তর চিকিৎসাশিক্ষার মানোন্নয়নে বেশ কিছু সুশাসনিক ব্যবস্থা সাম্প্রতিক অতীতে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হয়েছে। তবে

মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ভর্তি দুর্নীতিতে এখনো কঠোর নজর রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই মেডিকেল কলেজ এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন মূলত রাজনৈতিক বিবেচনাতেই দেওয়া হয়ে থাকে; এর পেছনে কোনো নীতিমালা, বিচার-বিশ্লেষণ বা বিজ্ঞান কাজ করে না; তবে অনুমোদনের নথিতে কোনো না কোনো যুক্তি অবশ্যই থাকে, যার ভাষা দায়মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে রাখে। সচরাচর যিনি যখন ক্ষমতার বলয়ে, তাঁর এলাকা সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অনুমোদনে অগ্রাধিকার পায়।

মেডিকেল কলেজগুলোর ওপর করা গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারি-বেসরকারি দুই প্রকার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদনই মূলত রাজনৈতিক কারণে দেওয়া হয়। কাঠামোগত, শিক্ষাগত, রোগশয্যাসংক্রান্ত, পাঠ্যসূচিসংক্রান্ত ও পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত মানদণ্ড না মেনেই সরকারি ও বেসরকারি উভয় জাতীয় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো সরকারি মেডিকেল কলেজের তুলনায় বেশি দ্রুততার সঙ্গে তাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। বেসরকারি খাতের দ্রুততার পেছনে দক্ষতা, উদ্যোগ এবং দুর্নীতি—সবকিছুর মিশেল আছে বলে মনে করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১-তে মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা, অনুমোদন, আসনসংখ্যার যৌক্তিকতা নির্ধারণে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়ার উল্লেখ আছে; কিন্তু তা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেই। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অনুমোদন নেওয়ার জন্য, আসনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য ঘুষ প্রদান অথবা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার কিংবা উভয় রাস্তা খুলে যায়।

মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের নার্সিং ও প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পর্যবেক্ষণ রয়েছে। অতিসম্প্রতি একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সম্পর্কে পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে পরিদর্শক দলের সুনির্দিষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মুচলেকা নিয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চালু রাখা এবং আসনসংখ্যার অনুমোদন দিয়েছে। এর সবটাই যে রাজনৈতিক প্রভাব ও বিবেচনায় প্রদত্ত, তা সহজেই অনুমেয়।

স্বাস্থ্য খাতে, বিশেষ করে সরকারি স্বাস্থ্য খাতে প্রশিক্ষণ হলো দুর্নীতির একটি সহজতম পন্থা। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিভিন্ন অপারেশনের প্ল্যানে (ওপি) দেশব্যাপী প্রশিক্ষণের নামে দুর্নীতির চর্চা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, একটি করে ব্যাগ, খাতা, কলম ও স্মারকের ব্যবস্থা করা হয়। দুই বেলা নাশতা, দুপুর ও রাতের খাবার, বাসস্থান ইত্যাদি খরচ সংকুলানের জন্য অনুমোদিত হারে বাজেট করা হয়। সরকারি চাকরিতে কর্মরত থাকা সময়কালেও প্রশিক্ষক

হিসেবে বিভিন্ন ভাতার ব্যবস্থা থাকে। ভুতুড়ে প্রশিক্ষকের খাবার, যাতায়াত ও প্রশিক্ষণের সরঞ্জামাদির জন্য অর্থ দাবি করা হয়ে থাকে। ভুয়া সই সংগ্রহ করে বিল দাখিল করা হয়। আবার দেখা যায় ওই মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তা 'রিসোর্স পারসন' হিসেবে সম্মানী দাবি করেন অথবা একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাপ্তরিক কাজের উপস্থিতি দেখানো হচ্ছে। যেহেতু কিছু কর্মকর্তা জড়িত, তাই এসব প্রতারণার কথা প্রায়ই অজানা থেকে যায়। সচরাচর প্রশিক্ষক তালিকায় বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে আসীন কর্মকর্তারাই অধিভুক্ত হন। তাঁরা প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, প্রশিক্ষণ ভাতার খাম প্রাপ্তি স্বাক্ষর সাপেক্ষে কর্মকর্তারা পেয়ে যান। এই খাম যদি দাতা সংস্থা থেকে আসে, তাহলে ভাতার হার সরকারি হারের চেয়ে আরও আকর্ষণীয় হয়। বিভিন্ন কাজের চাপে মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণের সময় সংক্ষিপ্ত করা হলেও কাগজে-কলমে তা বাজেটের প্রায় সমপরিমাণই থাকে। এসব কারণেই স্বাস্থ্য খাতে প্রশিক্ষণ মানেই খাম এবং স্বাক্ষরবাণিজ্য—এমন প্রবচন চালু আছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে উপস্থিত না থেকেও যে পরিমাণ খাম গ্রহণ করেছিলেন, তার মোট পরিমাণ ছিল কোটি টাকার কাছে। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি এবং অডিট আপত্তির কারণে ওই কর্মকর্তা ৭২ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেন।

স্বাস্থ্য খাতে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও প্রমোদভ্রমণের মধ্যে ব্যবধান খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বিভিন্ন অপারেশনের প্ল্যানে এমনভাবে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয় যে তা নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল। বিভিন্ন দাতা সংস্থার ওজর-আপত্তি ও নিয়মকানুনের কঠোর প্রয়োগের কারণে ইদানীং বেশির ভাগ বিদেশ সফর বাংলাদেশ সরকারের তথা নাগরিকদের করের টাকায় হয়ে থাকে। প্রকল্প অনুমোদনসংশ্লিষ্ট সব সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়েই প্রতিনিধিদল গঠিত হয়; ফলে আপত্তি জানানোর আর কেউ বাকি থাকে না। কখনো কখনো মিডিয়ার প্রতিনিধিও দাতা সংস্থার অর্থায়নে প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তখন বাহুল্য নিয়ে রিপোর্ট করার মতোও কেউ থাকে না, বরং সেই সব প্রশিক্ষণ বা সম্মেলনের গুণকীর্তনের সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। সরকারি আয়োজনের বাইরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে বিশাল আকার-আয়তনের প্রতিনিধিদল যোগদান করে থাকে। বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির ওপর চাপ প্রয়োগ করে প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এ প্রবণতা গত দুই দশকে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী সংস্থা, যারা হাসপাতালগুলোয় অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উচ্চ মূল্যে সরবরাহ করে, তারাও স্থানীয় ক্রয় কমিটির সদস্যদের বিদেশভ্রমণের আয়োজন করে থাকে। এ-জাতীয় বৈদেশিক শিক্ষাসফরের অনুমোদন অথবা বৈদেশিক ছুটি ঠিকাদার সংস্থাগুলোই 'ম্যানেজ' করে।

সব মিলিয়ে, প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক ও উচ্চতর শিক্ষাসফরের পর্যটক—কমবেশি সবাই রাজনৈতিক বিবেচনায় বাছাই হন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুর্নীতিতে অংশগ্রহণ করেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে আছে যে এই খাতে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বৈদেশিক সফরে সুনির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ বিবেচনা করা উচিত।

ক্রয়াদেশ

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির একটি প্রধান জায়গা হলো ক্রয়াদেশ। এর কারণ সম্ভবত এই প্রক্রিয়ায় বিরাট টাকার অঙ্ক জড়িত থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয় তেমন কোনো মনোযোগ পায় না। আবার এ বিষয়ে যদি সংবাদ প্রকাশিত হয় কিংবা ক্ষুব্ধ কোনো পক্ষ যদি ক্রয়াদেশ পেতে ব্যর্থ হয়ে অভিযোগ দাখিল করে, তাহলেই শুধু বিষয়টি মানুষের নজরে আসে। ক্রয়াদেশের ক্ষেত্রে দুর্নীতি এই প্রক্রিয়ার প্রায় সব স্তরেই হয়ে থাকে। একেবারে পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ক্রয়াদেশ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত দুর্নীতি হয়ে থাকে। এমনকি সরবরাহ প্রক্রিয়ায় পর্যন্ত দুর্নীতি হয়ে থাকে। মোটের ওপর, অশুভ আঁতাত করা, ভুয়া বিল বানানো ও প্রতারণা হলো দুর্নীতির পদ্ধতি। চিকিৎসা সরঞ্জামাদির সরকারি ক্রয়াদেশের ক্ষেত্রে যেসব দুর্নীতি হয়ে থাকে, তা ওপরে বর্ণিত দুর্নীতির ধরন থেকে ভিন্ন। কিন্তু অল্প কিছু মানুষের কারণে সাধারণ জনগণের দেওয়া করের বিরাট অংশ এই প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়। রাজনীতির ক্ষমতাকাঠামো ও সরকারের ঘনিষ্ঠ কিছু লোক এই প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হন। তবে তাঁদের শক্তিশালী ক্ষমতার ভিত্তি আর রাজনৈতিক এলিটদের সঙ্গে সংযোগ থাকায় এসব অপকর্মে লিপ্ত লোকেরা সাজা থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকেন। এসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সচরাচর ঘটে না।

পরিকল্পনার সময় খুবই উচ্চ দরের যন্ত্রপাতি কেনার পরিকল্পনা করা একটি সাধারণ প্রবণতা। মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে এসব উচ্চ দরের যন্ত্রপাতির কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও তা ক্রয়াদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে গিয়ে প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে যন্ত্রপাতির তালিকা ধরিয়ে দিয়ে আসে, যেন তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহের চাহিদা পেশ করা হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানপ্রধান এর অন্যথা করলে তাকে দ্রুত নিবর্তনমূলক বদলি বা পদায়ন করা হয়। সাধারণত এসব ক্রয়াদেশ দেখানো হয় একক কাজ হিসেবে, যেখানে সেগুলোর ব্যবহার বা প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয় না। যেমন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য লিনিয়ার যন্ত্র কেনা হয়েছিল। কিন্তু এটা সবাই জানত যে

সেখানে সেই যন্ত্র পরিচালনা করার মতো কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই (এ ক্ষেত্রে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ)। এমনকি কাউকে সেই যন্ত্র চালানো ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি ঠিকমতো। এই দামি যন্ত্র তখন হাসপাতালের বারান্দায় দুই বছরের বেশি সময় পড়ে ছিল। এরপর তা ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

টেন্ডার প্রক্রিয়া 'মনঃপূত' করার জন্য বেশ কিছু কৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আশীর্বাদপুষ্ট সরবরাহকারী একজনই তিনটি ভিন্ন নামে আলাদা ফরম পূরণ করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দাম দাখিল করে। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অন্তত তিনজন আবেদনকারী হতে হয়। নিলাম মূল্যায়নকারী কমিটির সিদ্ধান্ত সাধারণত সেখানকার কর্মকর্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা সাধারণত 'সহায়তা' করেন। বাজারমূল্যের চেয়ে ইউনিট খরচ বেশি দেখানোর ক্ষেত্রেও এসব কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে সস্তা পণ্য বেশি মূল্যে কেনা হয়। প্রায়ই সম্ভাব্য অন্যান্য নিলামকারী এবং ক্রয়াদেশের সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের ভয় দেখানোর জন্য মাস্তান নিযুক্ত করা হয়। মিডিয়ার সৌজন্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এ-জাতীয় সরবরাহকারী কারা, তা কমবেশি সবাই জানেন; শুধু জানে না নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব বদল হলেও এসব ঠিকাদারদের দৌরাত্ম্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সুশাসনের উন্নতি না হয়ে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এমনভাবে হয়েছে যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন সাধারণ কর্মচারীও আক্ষরিক অর্থেই কেনাকাটায় দুর্নীতি করে শত শত কোটি টাকা বিদেশে পাচার করতে সক্ষম হয়েছেন। পারদর্শী গোয়েন্দা সংস্থা চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির প্রতিবেদন প্রদানে সক্ষম হলেও শতকোটি টাকার দুর্নীতি ও অর্থ পাচার বিষয়ে অন্ধকারে থেকেছেন।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যায় ভুয়া বিল বানানো দুর্নীতির আরেকটি পন্থা। প্রায়ই দ্রব্যাদির পরিমাণ ও মূল্য প্রভাবিত করা হয় এবং অতিরিক্ত মূল্য ধরা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য যখন অগ্রিম অর্থ নেওয়া হয়, তখন অর্থ ব্যয়ের প্রকৃত হিসাব গুরুতরভাবে হেরফের করা হয়। দুর্নীতির আরেকটি ক্ষেত্র হলো হাসপাতাল ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নতকরণ। নির্মাণ খরচের হিসাবে একেবারে শুরু থেকেই বিভিন্ন স্তরে কর্মকর্তাদের অর্থ প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকে। নির্মাণকাজ হয়ে থাকে নিম্নমানের। অনেক সময় সেগুলো অনুমোদিত বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ এ ধরনের প্রতারণার স্পষ্ট উদাহরণ। দেখা যায়, কমিউনিটির মানুষকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন এনজিও একই রকম ক্লিনিক তৈরি করেছে। কিন্তু সেগুলো আরও ভালো মানের ক্লিনিক এবং সব ধরনের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে।

মহামারিকালে দুর্নীতির মহামারি

স্বাস্থ্য খাতে অতীতের সব রেকর্ড এবং কল্পরাজ্যের পরিসীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে সাম্প্রতিককালের কোভিড মহামারিকালীন দুর্নীতি। অনিয়ম-দুর্নীতি স্বাস্থ্য খাতের নতুন বিষয় নয়। মহামারির সময় তার বহিঃপ্রকাশ ছিল অভাবিত। করোনাকালে স্বাস্থ্য সরঞ্জাম বা কেনাকাটায় দুর্নীতি হবে, এটা সাধারণ মানুষের চিন্তাতে ছিল না। দরিদ্র দেশ, সীমিত সম্পদ, দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি—মানুষ এসব নিয়ে চিন্তিত ছিল। কিন্তু অনিয়ম ও দুর্নীতি সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেল। একপর্যায়ে মহামারি চাপা পড়ে গেল দুর্নীতির খবরে।

মহামারি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট কেনাকাটায় দুর্নীতির ঘটনা প্রথম প্রকাশ করেন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তখনকার পরিচালক। ওই হাসপাতালে 'এন ৯৫' নামের যে মাস্ক সরবরাহ করা হয়, তা নিয়ে তিনি আপত্তি তোলেন। একই ধরনের আপত্তি তোলেন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক। প্রথমে সেই অভিযোগ বা আপত্তি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমলে নেয়নি। পরবর্তী সময়ে তদন্তে দেখা যায়, ওই মাস্ক সরবরাহে দুর্নীতি হয়েছিল। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পাসকৃত হুইসেল ব্লোয়ার সুরক্ষা আইন ২০১১ অনুযায়ী যাঁরা দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন, তাঁদের সুরক্ষা পাওয়ার কথা। বরং অন্য কারণ দেখিয়ে একজন কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়, অন্যজনকে বদলি করা হয়। দুদক তাঁদের সুরক্ষার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়নি।

করোনাকালে বেশি অভিযোগ উঠেছিল চিকিৎসক, নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (পিপিই) ক্রয় ও সরবরাহ নিয়ে। শুরুর দিকে মানসম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মান অনুয়ায়ী পিপিই কেনা হয়নি। চিকিৎসকেরা পিপিইর মান নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন। বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচের গবেষণা প্রতিবেদনেও বিষয়টি উঠে আসে। পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশ পায় যে এমন সব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চিকিৎসাসামগ্রী কেনা হয়েছিল, যাদের চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করার অভিজ্ঞতা ছিল না। যেমন সড়ক ও উড়ালসেতু নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও চিকিৎসাসামগ্রী কেনা হয়েছিল। এসব অভিযোগের সত্যতা যখন প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, তখন অভিযোগ ওঠে যে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় চলা প্রকল্পেও অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে। এই দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১ হাজার ৭০০ কোটি অর্থঋণ দিয়েছে মহামারি মোকাবিলায়। গণমাধ্যমে একের পর এক প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রথমে পরিকল্পনা শাখার পরিচালককে ওএসডি করে সরকার।

তবে দুটি দুর্নীতির ঘটনা অন্য সব ঘটনাকে পেছনে ফেলে দেয়। জেকেজি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানুষকে করোনা শনাক্তকরণের ভুয়া সনদ

দেওয়ার ঘটনা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। একই সময় এটাও জানা যায় যে রিজেন্ট নামের একটি বেসরকারি হাসপাতালকে নীতি ও আইনবহির্ভূতভাবে করোনা চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। গোয়েন্দা সংস্থা এই দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম খুঁজে পায়। দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গণমাধ্যমকে একাধিকবার বলেছে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা ছাড়া দুটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ওই অনিয়ম করা সম্ভব নয়। কিন্তু শুধু এই দুটি প্রতিষ্ঠানই নয়, এমন আরও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দিয়েছিল করোনা শনাক্তকরণ পরীক্ষার। ওই পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা আছে কি না, তা যাচাই করেনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। পরে তাদের অনুমতিও বাতিল করা হয়।

একদিকে গণমাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর প্রকাশ পেতে থাকে, অন্যদিকে সরকারি বড় বড় পদে রদবদল হতে দেখা যায়। দেশে যখন করোনার সংক্রমণ ও করোনায় মৃত্যু বাড়তে শুরু করেছে, এমন সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিবকে অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয় এবং পদোন্নতি দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব, যিনি সচিবালয়ে নিজ অফিসে না গিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অফিস নিয়ে কাজ করতেন ও নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করতেন, তাকেসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাকেও বদলি করা হয়। জরুরি সময়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলিতে অনেকের মনে নানা সন্দেহ দানা বাঁধে। পরিবর্তন দেখা দেয় মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ পদে। অনিয়মের অভিযোগ উঠলে সরিয়ে দেওয়া হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দুই পরিচালককে। চলে যান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদার কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের পরিচালকও। একসময় পদত্যাগ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

এসব ঘটনা এমন সময় ঘটেছিল, যখন করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে ছিল না, হাসপাতালে প্রতিদিন মৃত্যু বেড়ে চলেছে। স্বাস্থ্য খাতের সর্বশক্তি নিয়োগ করার দরকার ছিল করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও রোগীর চিকিৎসায়। ঠিক এমন সময়ে নড়েচড়ে বসে দুদক। তারা অভিযান চালায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে; এবং বিভিন্ন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও কাগজপত্র তলব করে। মহামারি নিয়ন্ত্রণের কাজের চেয়ে দুদকের জন্য কাগজপত্র ও মন্ত্রণালয়ের জন্য ব্যাখ্যা তৈরি করা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহ স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকে উৎকটভাবে প্রকাশিত করেছে। মূল দায় ও দুর্বলতা স্বাস্থ্য অধিপ্তরের দিকে নির্দেশিত হলেও অন্যান্য অংশীজনের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে অর্থঋণভিত্তিক প্রকল্প স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রণয়ন করলেও তা স্বাস্থ্য

মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সেল, স্বাস্থ্যসচিব, ঋণদানকারী ব্যাংক দুটি এবং সর্বোপরি পরিকল্পনা কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তেই অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে। কাজেই, অংশীজন হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোও দুর্বল পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং দুর্নীতির সূত্রপাতে অংশীজনের দায় এড়াতে পারে না। অংশীজনেরা যাচাই-বাছাইয়ের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে এ-জাতীয় পরিকল্পনা ও দুর্নীতি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা নয়। সম্প্রতি নিয়োগের সপ্তাহখানেক পর মহাপরিচালককে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক হিসেবে অভিহিত করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়াতেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক দক্ষতার ছাপ রাখতে পারেনি। প্রশ্ন ওঠে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত মহাপরিচালক পদে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করে নিয়োগের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুমোদনের ফাইল পেশ করেছিল কি না।

এটা সুস্পষ্ট যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে কখনোই সমন্বয় এবং টিমওয়ার্ক ছিল না। তাদের মিথস্ক্রিয়ায় সদ্ভাবের চেয়ে আন্তক্যাডার স্নায়ুযুদ্ধই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গঠিত জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি এবং তার সমান্তরালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। স্বাস্থ্য খাতসংক্রান্ত উন্নয়ন সহযোগীরা স্বাভাবিক সময়ে এককাট্টা হয়ে কাজ করলেও মহামারি চলাকালে তাদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার ঘাটতি এবং মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও জনগণের প্রয়োজনে চটজলদি সাড়া প্রদানে সফল হয়নি। এমনকি পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা জনস্বাস্থ্যগত গুরুত্ব অনুধাবনে সফল হতে পারেননি। সন্দেহভাজন ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ, রোগ শনাক্তকরণ পরীক্ষা, আইসোলেশন, কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং, কোয়ারেন্টিন এবং হাসপাতালগুলোতে কোভিড ও নন-কোভিড রোগীর চিকিৎসায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। সমগ্র বিশ্বের এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে এ রকম সংকটময় মুহূর্তে বিদ্যমান প্রশাসনিক দক্ষতা এবং জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা জ্ঞান এবং জনগণের সার্বিক সহযোগিতার সুসমন্বয়ে এই মহামারি দক্ষতার সঙ্গেই মোকাবিলা করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে বলিষ্ঠ ও দৃঢ় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকটে কার্যকরভাবে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত দুরূহ হয়ে পড়ছে।

তবুও আশার হাতছানি

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত সম্পর্কে ওপরের বর্ণনা থেকে এক ভয়ানক চিত্র পাওয়া যায়। তবে আমরা জানি যে অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়।

স্বাস্থ্য খাতের সাম্প্রতিক বিপর্যয় থেকে দেশের আপামর জনগণ বুঝতে পেরেছে যে স্বাস্থ্য খাতের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং

ইনফরমাল স্বাস্থ্যসেবাদাতাদের মান নিয়ন্ত্রণে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। বর্তমান অর্থবছরে সরকার স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের জন্য বিপুল পরিমাণ থোক বরাদ্দ রাখলেও স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের রূপরেখা নিয়ে এখনো কোনো বুদ্ধিদীপ্ত বিতর্ক বা আলোচনার আয়োজন করেনি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বরেণ্য শিক্ষাবিদ কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে শিক্ষা খাতের সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। আমরা চাই, বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথে স্বাস্থ্য খাতের আমূল সংস্কারের জন্য সে রকম একটি স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করবেন, যে কমিশনের সুপারিশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

বড় দাগের এই সুপারিশের পাশাপাশি রুপালি রেখায় ছোট ছোট উদ্যোগের উল্লেখ করা প্রয়োজন, যা আশার আলো ছড়ায়। সরকারি খাত থেকে উন্মুক্ত বাজারে ওষুধের ছিঁচকে চুরি বন্ধ করতে সরকারিভাবে ক্রয়কৃত সব ধরনের ওষুধের প্যাকেটের গায়ে লাল আর সবুজ রং ব্যবহার করা হয়। সেখানে স্পষ্টভাবে সতর্কতা লেখা আছে যে এগুলো সরকারি সম্পত্তি। এরপর থেকে উন্মুক্ত বাজারে সরকারি ওষুধ পাচার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

কমিটি পুনর্গঠন এবং প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলকে (বিএমডিসি) পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। যদিও বিএমডিসি গত চার দশকে মাত্র দুজন ডাক্তারের নিবন্ধন বাতিল করেছে, কিন্তু বিএমডিসি এখন চিকিৎসার আচরণবিধি, মেডিকেল রেকর্ড ইত্যাদির মতো মূল বিষয়গুলোর ওপর নজর দেওয়া শুরু করেছে।

প্রশংসার সঙ্গে বলতে হয় যে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ডিজিটাল করার ফলে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পরিবার পরিকল্পনা সেবার জিনিসপত্রের অনলাইনে খোঁজখবর রাখার ব্যবস্থা থাকায় সময়মতো ক্রয়াদেশ, নির্বিঘ্ন সরবরাহ ও বিতরণের ওপর প্রতিবেদন দেওয়া সম্ভব হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২৪ ঘণ্টা কল সেন্টার থেকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ দেওয়া হয়। ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণের পূর্ণ সম্ভাবনা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত চর্চার ওপর এর প্রভাব এখনো পুরোপুরি বোঝা যাবে না, তবে প্রাথমিক লক্ষণগুলো বেশ আশাপ্রদ। তবে করোনাকালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য প্রদানে যে নেতিবাচকতা ও রুদ্ধদ্বার নীতি গ্রহণ করেছে, তা স্বাস্থ্য খাতের জবাবদিহিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তথ্যের স্বচ্ছতা ও অবাধ প্রবাহ দুর্ভিক্ষ রুখে দেওয়ার মতোই স্বাস্থ্য খাতের সেবার মানের অবনমন রোধে সহায়তা করবে। সরকারের প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষ করে অর্থঋণভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প, যার কিস্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিশোধ করতে

হবে, সেই সব প্রকল্পের মূল দলিল বিস্তারিত হিসাব বিভাজনসহ মন্ত্রণালয়ের ও পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইটে অনুমোদনের আগে জনমত যাচাই ও স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকাশ করা উচিত। উন্নয়ন প্রকল্প দলিলের স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ত প্রকাশ স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি দমনে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অনুমোদিত ওষুধ নীতি ২০১৬ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে। আন্তর্জাতিক অনুশীলন মেনে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে যেসব ওষুধ কোম্পানি রয়েছে, তারা ওষুধ বিক্রয় নীতিমালা ভঙ্গ করে যেসব ঘুষ প্রদান করেছে, সে বিষয়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। একইভাবে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোকে নিষ্ঠা ও নৈতিকতার নীতিমালা মেনে পরিচালিত হতে হবে এবং জনগণের সুবিবেচনার ব্যাপারে নমনীয় হতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে কাজ করা নাগরিক সংগঠনগুলোর নজরদারি ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

তবে এসব পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতের খুদে দুর্নীতিগুলো হয়তো কিছু বন্ধ করা সম্ভব। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে যেসব দুর্নীতি এই খাতে হচ্ছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক দুর্নীতির সুবিধাভোগীদের নিষ্ক্রিয় করাই বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্নীতি বন্ধে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন রাজনৈতিক নেতৃত্ব। আমরা আশা করব, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহার স্মরণ করে সেই অনুযায়ী কাজ করবে।

নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত আকারে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ভারত থেকে ২০১৮ সালে Healers or Predators? Healthcare corruption in India *গ্রন্থের একটি অধ্যায় আকারে ছাপা হয়েছিল। সম্পাদকের অনুমতিক্রমে হালনাগাদ ও পরিমার্জিত নিবন্ধটিতে প্রকাশিত মতামত লেখকদের নিজস্ব; লেখকদের কর্মরত সংস্থার এতে কোনো দায় নেই।*

খাতি চিন্তা
নৃতত্ত্ব

মহামারি ও আদিবাসী লোকায়ত স্বাস্থ্যবিধি

পাভেল পার্থ

সারসংক্ষেপ

অসুখ, নতুন রোগ সংক্রমণ ও মহামারি সামাল দিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের লোকবিজ্ঞান নিয়ে চলতি আলাপটির বিস্তার। বিশেষত কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর মহামারি সামাল দেওয়ার ঐতিহাসিক স্মৃতি ও সুরক্ষাবিধিগুলো দেশে নানা সমাজে নানা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। মহামারি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে লকডাউন, সঙ্গনিরোধ, সাময়িক বিচ্ছিন্নতা, বিশেষ খাদ্যাভ্যাস ও ভেষজ গ্রহণের ভেতর দিয়ে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানো এবং লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসার রেওয়াজ সুপ্রাচীন। চলতি লেখায় দেশের খাসি, জৈন্তিয়া, মীতৈ মণিপুরি, লেঙাম, কোচ, হাজং, ডালু, বর্মণ, কড়া, কডা, কোল, বেদিয়া মাহাতো, ওঁরাও, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, সাঁওতাল, মুন্ডা, চাক, চাকমা, খুমি, খিয়াং, পাংখোয়া, বম, লুসাই, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা, রাখাইন, ত্রিপুরা, ম্রো, লালেং, রবিদাস এবং মান্দি—এই ৩১ জাতিসত্তার মহামারি সামাল দেওয়ার লোকায়ত বিধি ও পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। প্রতিটি জাতির মাতৃভাষায় এসব সুরক্ষাবিধি ও কৃত্যগুলোর নাম উল্লিখিত হয়েছে। লকডাউন আর কোয়ারেন্টিনের প্রবল জ্ঞানকাণ্ডের সামনে এসব প্রান্তিক বয়ান হাজির করার উদ্দেশ্য হলো মহামারির এক প্রাথমিক বি-উপনিবেশ পাঠ। বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের মহামারি সামাল দেওয়ার ঐতিহাসিক পদ্ধতি বিষয়ে এটিই প্রথম কোনো প্রাথমিক আলাপ। মহামারি সামাল দেওয়ার এই লোকায়ত জ্ঞানভাষ্য কোভিড-১৯ মহামারিসহ আগামী দিনের জটিল সংকট মোকাবিলার অনেক সূত্র ও সমাধান দিতে পারে। এই আলাপে বর্ণিত জ্ঞানপদ্ধতিগুলোর সূত্র ও সম্মতিবিহীন একতরফা বাণিজ্যিক ব্যবহারকে আদিবাসী সমাজ ‘মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন’ হিসেবে বিবেচনা করার অধিকার রাখে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

মহামারি, করোনাকাল, কোভিড-১৯, আদিবাসী লোকায়ত স্বাস্থ্যবিধি, লকডাউন, সঙ্গনিরোধ, বি-উপনিবেশ, সামাজিক কৃত্য

করোনাকালের এক বি-ঔপনিবেশিক চিন্তাসূত্র

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহানে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হলে বিষয়টিকে 'প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশের' সংকট হিসেবে ধারাবাহিক লেখালেখি শুরু করি ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে। তখনো 'কোভিড-১৯' রোগের নামটি পরিচিত হয়নি, এমনকি তখনো বৈশ্বিক মহামারি তৈরি হয়নি। ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে করোনাভাইরাসের সংক্রমণকে নয়া উদারবাদী বা নিউ লিবারেল ব্যবস্থার এক পরিবেশগত জটিল সংকট হিসেবে চিহ্নিত করে লিখি 'করোনাভাইরাস ও অমীমাংসিত পরিবেশ প্রশ্ন'। লেখাটি দৈনিক *দেশ রূপান্তর*-এ ৫ ফেব্রুয়ারি, দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এ ৬ ফেব্রুয়ারি এবং দৈনিক *বণিক বার্তায়* ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়।[১] করোনা সংক্রমণের পর থেকে বিশেষ করে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে মার্চ ২০২০—এই চার মাস 'পরিবেশ-প্রতিবেশগত সংকটের' ময়দান থেকে কোনো বৈশ্বিক আলাপ শুরু হয়নি। এপ্রিলের মাঝামাঝি কিছু লেখালেখি শুরু হয় এবং গণমাধ্যম বিষয়টিকে 'প্রকৃতি সুরক্ষা ও দূষণ হ্রাসের' চশমায় কিছুটা আলোচনায় আনতে শুরু করে।

পরবর্তীকালে করোনাকালের ধারাবাহিক লেখালেখিতে 'পরিবেশ প্রশ্ন, প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশসংকট, বন্য প্রাণী বাণিজ্য, লোকায়ত জ্ঞান, উন্নয়ন দর্শন, কৃষি ও প্রাণসম্পদভিত্তিক উৎপাদন, নয়া উদারবাদী কর্তৃত্ব, প্রান্তিকতা ও আদিবাসী প্রসঙ্গকে' কেন্দ্রসূত্র হিসেবে সমন্বয় করার চেষ্টা শুরু করি। মে ২০২০ থেকে করোনাকালের আলাপে এক বিস্ময়কর মেরুকরণ তৈরি হতে শুরু করে। 'প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ প্রশ্ন এবং লোকায়ত জীবনদর্শন' এ সময়ের এক অনন্য আলাপের ধারা হিসেবে ডানা মেলতে থাকে। বাংলাদেশেও অনেকে এ নিয়ে লেখালেখি প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং অনলাইনে অন্যান্য দেশের নানাজনের লেখা, মতামত ও বিবৃতি প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

পরবর্তীকালে মে থেকে জুলাই ২০২০ অবধি 'কোভিড-১৯ মহামারি এবং প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশের সংকট' বিষয়ে বৈশ্বিক পরিসরে একটা জোরালো আওয়াজ তৈরি হতে শুরু করে। অবশ্য এর ভেতর ২০ মে ঘূর্ণিঝড় আম্পানের আঘাত, ২২ মে 'আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য দিবস', 'মরুভূমি অঞ্চলে পঙ্গপালের বিস্তার' এবং ৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' করোনাকালে নানাজনের লেখালেখিতে নানাভাবে 'পরিবেশ-প্রশ্নের' প্রভাব তৈরিতে একটা গৌণ ভূমিকা রেখেছে। পরিবেশ, প্রাণবৈচিত্র্য, বন্য প্রাণী ও সুরক্ষা নিয়ে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর বিবৃতি এবং বিশেষ লেখাতেও বিষয়টিকে নিজস্ব অবস্থান থেকে অনেকে স্পষ্ট করতে থাকেন। এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে করপোরেট ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা, কার্বন নিঃসরণ ও জলবায়ু বিপর্যয়, মাতৃদুনিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা মুনাফার ক্ষমতা, জীবাশ্মজ্বালানি বিষয়ে তর্ক আর

প্রকৃতির প্রতি নাগরিক দায়িত্ববোধ। এ সময়কালে প্রকাশিত উল্লিখিত বেশ কিছু মূলত ইংরেজি লেখা 'জেনেভা এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক' তাদের ওয়েবসাইটে[২] একত্র করে হালনাগাদের ব্যবস্থা করেছে। হয়তো পৃথিবীর নানা ভাষায় নানা জনে এই করোনাকালে বৈচিত্র্যময় সব পরিবেশবয়ান হাজির করেছেন, যা ভাষিক ঔপনিবেশিকতা ও জ্ঞানকাণ্ডের ক্ষমতার প্রশ্নে প্রান্তিক হয়ে থাকায় সবার 'নাগাল ও নজরে' আসছে না। তবে চলতি আলাপটি করোনা মহামারি, নয়া উদারবাদী ভোগবাদ এবং পরিবেশ প্রশ্নকে সরাসরি টানছে না। আলাপটি 'করোনা মহামারিকালে'[৩] দাঁড়িয়ে 'মহামারির' এক বি-উপনিবেশিক পাঠ হাজির করতে সাহস করেছে। করোনাকালে প্রতিষ্ঠিত অধিপতি জ্ঞানকাণ্ড ও বিদ্যায়তনের স্বাস্থ্যবিধিসম্পর্কিত যেসব প্রবল প্রচারণা, তা কোনোভাবেই দুনিয়ার জনজ্ঞানপরিসরকে কোথাও জায়গা দেয়নি, স্বীকৃতি তো দূরের কথা। মহামারি সামালের প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত 'স্বাস্থ্যবিধি জ্ঞান' প্রবলভাবে অস্বীকার করে চলেছে নিম্নবর্গের মহামারি সামালের ঐতিহাসিক জ্ঞানভাষ্যকে। চলতি আলাপ তাই মহামারিকালে প্রদেয় 'সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিসম্পর্কিত' বৈশ্বিক অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে 'ঔপনিবেশিক বাহাদুরি' হিসেবে পাঠ করছে এবং প্রমাণ হাজির করছে ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত মহামারি মোকাবিলার স্বাস্থ্যবিধিগুলো পালনের বহু নজির ও বৈচিত্র্যময় ভাষ্য নিম্নবর্গের যাপিতজীবনে বহু আগে থেকেই চর্চিত এবং এখনো বহমান। আর এটি প্রমাণের জন্য চলতি আলাপটি দেশের ৩১টি আদিবাসী জাতির মহামারি সামালের স্মৃতি ও জ্ঞানভাষ্যের আশ্রয় নিয়েছে।

'করোনা মহামারিসংকট' এবং 'প্রাণ-প্রকৃতির দর্শন'—সামগ্রিক বিষয়টি বুঝতে মহামারি নিয়ে আদিবাসী বিজ্ঞান ও আদিদর্শনের শরণাপন্ন হই। ৮ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার পর মার্চে লিখি 'করোনা মোকাবিলায় আদিবাসী প্রসঙ্গ'।[৪] রোগশোক সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসী ও বাঙালি সংস্কৃতির বাৎসরিক সংক্রান্তিভিত্তিক কৃত্যকে কেন্দ্র করে লিখি 'অসুখ, মহামারি ও সংক্রান্তির শক্তি'। লেখাটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল আইপি নিউজে চলতি বছরের ২৭ মার্চ প্রকাশিত হয় (www.ipnews.com.bd)। পরবর্তীকালে আগের লেখাটির সূত্র ধরেই আরেকটু সুনির্দিষ্টভাবে মহামারি সামাল দেওয়ার আদিবাসী ও বাঙালি নিম্নবর্গের লোকায়ত পদ্ধতিগুলো নিয়ে লেখা 'অসুখ, মহামারি ও লোকায়ত শক্তি' ১৪ এপ্রিল ২০২০-এ দৈনিক *সমকাল*-এর বিশেষ সংখ্যায়[৫] প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে মে থেকে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত নানাভাবে আদিবাসী জাতিগুলোর মহামারি সামালের পদ্ধতিগুলো জানার চেষ্টা করি। চলমান করোনা মহামারিকালে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সময় কিংবা পরিসর সব মিলিয়ে কাজটি 'সহজ' ছিল না। ই-মেইল, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, মুঠোফোন—নানাভাবে নানাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি বারবার। বিশেষ করে নিজ নিজ আদিবাসী মাতৃভাষার শব্দগুলো

'বাংলা হরফে' ঠিক আছে কি না কিংবা বিষয়টি বুঝতে আমি সমর্থ হয়েছি কি না—এটি যাচাই করতে গেছে এক দীর্ঘ সময়। এর ভেতর দেশের ১০০ প্রবীণের 'মহামারির স্মৃতি-বিস্মৃতি' নিয়ে এক জটিল স্মৃতিচারণামূলক সাক্ষাৎকারধর্মী গবেষণার কাজ শুরু করলে আবার কিছু তথ্যের পুনর্যাচাই সম্ভব হয়। অসুখ ও মহামারি সামালের বেশকিছু বিধি ও কৃত্যে দেশের নানা প্রান্তে নানা সময়ে অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে এক বিরল শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু চলতি আলাপে বর্ণিত অনেক কৃত্য ও বিধি আমার কখনোই দেখা হয়নি, বলা দরকার শোনাই হয়নি। বিশেষ করে মহামারিকালে আদিবাসী সমাজের লোকায়ত লকডাউন ও সঙ্গনিরোধ রীতিগুলো।

আমার বহু বছরের অংশগ্রহণমূলক গবেষণাবলয়ের বাইরে এসে রাষ্ট্রনির্দেশিত করোনা স্বাস্থ্যবিধি মান্য করে কেবল দূর থেকে কানে শুনে বোঝার ভেতর দিয়েই চলতি আলাপের অনেক বিষয় আত্মস্থ করতে হয়েছে। এখানে ঘাটতি থাকাটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে যখন বাংলা হরফে আদিবাসী শব্দ ও উচ্চারণগুলো লেখা হচ্ছে। জানি এই প্রক্রিয়ায় একধরনের অতিসাধারণীকরণ ও ঔপনিবেশিকতা বহাল থাকে, কিন্তু এর বাইরে সব জাতির তথ্যগুলো একত্র করার ক্ষেত্রে আমার আর কিছুই এই করোনাকালে করার ছিল না। এ কারণে ক্ষমা ও দুঃখপ্রকাশ করছি। তারপরও আমি একটি জাতির নানা অঞ্চলে তথ্য যাচাই করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, বিশেষ করে নারী ও পুরুষের সঙ্গেও আলাদাভাবে, বয়স ও শ্রেণি-পেশাভেদেও। করোনা সংকট ও আদিবাসী প্রশ্নে দেশ ও বিশ্ব প্রথম পাঁচ মাস প্রবল নিশ্চুপ থাকলেও মে থেকে জুলাই ২০২০ আদিবাসীবিষয়ক কিছু সংগঠন এবং গণমাধ্যম 'আদিবাসী প্রশ্নকে' কিছুটা আলাপে আনার চেষ্টা করেছে। যদিও সেসবের অধিকাংশই আদিবাসীজনের সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা ও সুরক্ষাবলয়ে তাদের অভিগম্যতা কিংবা বিশেষ সহায়তাবিষয়ক। তবে ১৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখে প্রকাশিত ক্যারোলিন স্মিথ মরিস একটি লেখায় জানান, জনগোষ্ঠীভিত্তিক 'সেল্ফ আইসোলেশন' আদিবাসী সমাজে নতুন কিছু নয়। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতেও আদিবাসীরা নিজস্ব অনেক লোকায়ত পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছেন। ফিলিপাইনের লুজনের ইগরট আদিবাসীরা 'সোলাং পুউউটেন'-এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা এবং 'ঙিজিলিন'-এর মাধ্যমে সঙ্গনিরোধ করছেন। একইভাবে থাইল্যান্ডের পাহাড়ি এলাকার কারেন আদিবাসীরা 'ক্রো-ইয়্যে'-এর মাধ্যমে গ্রাম লকডাউন করেছেন।[৬] এ ছাড়া রাহুল গান্ধী (২০২০) ভারতের অরুণাচলের আদিবাসীদের লোকায়ত লকডাউন বিষয়ে ২৭ মার্চ প্রকাশিত একটি লেখায়[৭] জানান, চীনের হুবেই প্রদেশের সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত অরুণাচলের আদিবাসীরা কোভিড মহামারি সামাল দিতে নিজস্ব 'আর-রিনাম' কৃত্য আয়োজন করেছেন এবং 'আলি-তেরনামের' মাধ্যমে লকডাউন শুরু করেছেন। এপ্রিলে প্রকাশিত একটি খবরে[৮] গোক্কন (২০২০) জানান, ইন্দোনেশিয়ার পাপুয়া

দ্বীপের আদিবাসীরা বাঁশ দিয়ে তাঁদের অঞ্চলে নিজেরাই লকডাউন করেছেন, তবে লেখাটিতে আদিবাসীদের লোকায়ত লকডাউনের কোনো তথ্য ছিল না। ল্যাপনিটেন (২০২০) ফিলিপাইনের কর্ডিলারা অঞ্চলের আদিবাসীদের লোকায়ত লকডাউন বিষয়ে এপ্রিলে প্রকাশিত একটি লেখায়[৯] জানান, কর্ডিলারার আদিবাসীরা 'টেংগাও' পদ্ধতিতে লকডাউন শুরু করেছেন। এই লোকায়ত লকডাউনপ্রথা 'টে-এর', 'ট-অর', 'সিডেএ', 'ফার-ই', 'উবায়া' এবং 'টুংরো' নামেও অন্যান্য আদিবাসীর ভেতর প্রচলিত। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, বলিভিয়া, ইকুয়েডর বিশেষত আমাজন অরণ্যের আদিবাসী অঞ্চলে নিজস্ব লকডাউনের একটি খবরও জানা যায় এপ্রিলে প্রকাশিত প্রেইলের (২০২০) লেখায়[১০], যদিও সেখানে লোকায়ত লকডাউন প্রথাগুলোর কোনো বিবরণ ছিল না।

মহামারি সামাল দেওয়ার আদিবাসী লোকবিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক বিধি বিষয়ে কেবল বাংলাদেশ নয়; পৃথিবীতেই গবেষণা, নথি ও দলিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডে মহামারি তাই এক ঔপনিবেশিক চেহারা নিয়েই দাঁড়ায় বারবার। এই ঔপনিবেশিক বাহাদুরির সামনে নিম্নবর্গের এক যাপিত বিজ্ঞানকে হাজির করা নিঃসন্দেহে এক 'দুরূহ' কাজ। হয়তো এটিই মহামারিসংক্রান্ত দেশের প্রথম বি-ঔপনিবেশিক পাঠ। মহামারির বি-ঔপনিবেশিক এই পাঠখানা চলমান, তাই চলতি আলাপটিকে একটি খসড়া হিসেবেই ধরা যেতে পারে। শব্দ, ভাষ্য, তথ্যগত অনেক ত্রুটি এখানে আছে। সবার কাছে উন্মুক্ত আবদার থাকল এই ভাষ্যটিকে অধিকতর সঠিক করে তোলার। পাশাপাশি যেসব জনগোষ্ঠীর তথ্য এখানে সন্নিবেশিত হলো না, যদি কেউ উৎসাহিত হয়ে কাজটি করেন কিংবা আমাকে যোগাযোগের কোনো সূত্র দিয়ে সহায়তা করেন, তবে কাজটিকে আরও অংশগ্রহণমূলক কায়দায় এক বহুত্ববাদী পাটাতনে দাঁড় করানো যেতে পারে। আর এটি জরুরি এ কারণে যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জনে আমরা বৈশ্বিকভাবে ঘোষণা করেছি, 'কাউকে বাদ দিয়ে আমাদের উন্নয়নযাত্রা সম্ভব নয়'। আমরা কি করোনাকালে মহামারি সামালে দুনিয়ার অপরাপর সব প্রান্তিক জ্ঞানভাষ্য বাদ দিয়ে বা আড়াল করে একতরফাভাবে কোনো সামগ্রিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারব?

মহামারি ও বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজ

অধিপতিব্যবস্থার প্রবল জ্ঞানকাণ্ড ঐতিহাসিকভাবেই কাউকে প্রান্তিক করে দেয়, নিম্নবর্গের জ্ঞানজমানাকে অস্বীকার করে তার ওপর চাপিয়ে দেয় বিধির বাহাদুরি। করোনা মহামারিকালে এটি আরও প্রকট হয়েছে। মহামারি সামাল দিতে 'লকডাউন', 'আইসোলেশন', 'কোয়ারেন্টিন' বা 'লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসার' প্রচার এমনভাবে করা হয়েছে, যেখানে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, মহামারি সামালে নিম্নবর্গের কোনো ভূমিকাই নেই। এসব বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই বা বিধি পালনের কোনো দক্ষতা নেই।

অথচ মহামারি সামাল দিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত উল্লিখিত বিধিগুলো ঐতিহাসিকভাবে আদিবাসী সমাজে চর্চার চল আছে। করোনা সংক্রমণের প্রথম দিকে এসব কথা খুব প্রচলিত হয়েছিল যে 'সাধারণ মানুষ কোনো লকডাউন মানছে না, দূরত্ববিধি মানছে না এবং সাধারণ মানুষ মনে করে, এই গজব সৃষ্টিকর্তা দিয়েছেন, তিনিই এটি সারিয়ে তুলবেন'।

সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আড়াল করে এই 'সাধারণ মানুষ'-বর্গকে সাধারণীকরণ করে ফেলা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো কার চোখে, কার জ্ঞানপাটাতনে এই ভাষ্য হাজির হচ্ছে? কারা মানছে আর কারা মানছে না? জোরদারভাবে এই প্রশ্ন ওঠেনি। দেশের প্রায় প্রতিটি আদিবাসী জাতিতে মহামারির স্মৃতি আছে এবং মহামারি প্রত্যয়টির নিজস্ব মাতৃভাষায় শব্দ আছে। ভাষিক কাঠামোতে কোনো শব্দের আদি হদিস প্রমাণ করে তার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব। যদিও মহামারি বোঝাতে আদিবাসী জাতিরা কী শব্দ ব্যবহার করতেন, তা এখন খুব একটা প্রচলিত নয়, এটি খুঁজে পেতে চলতি আলাপকে বহু প্রবীণের বিস্মৃত স্মৃতির ভেতর দিয়ে যাত্রা করতে হয়েছে। করোনা মহামারির শুরু থেকেই আদিবাসী অঞ্চলগুলো নিজস্ব কায়দায় লকডাউন, আইসোলেশন, সঙ্গনিরোধ, বিশেষ খাদ্যাভ্যাস চালু করেছে। এখনো এটি বেশ গুরুত্ব দিয়েই পালন করছেন। কেন করতে পারছেন? কারণ, মহামারি সামাল দেওয়ার ঐতিহাসিক স্মৃতি ও বিধিচর্চার চল তাদের এখনো আছে। তবে আদিবাসী সমাজগুলো মহামারি সামাল দেওয়ার সব আদি নিয়ম ও রীতি সবাই সব সমাজে সব স্থানে সমানভাবে পালন করতে পারছে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানামুখী পরিবর্তন ও ক্ষমতাকাঠামোর ইতিহাস। চলতি আলাপ এ বিষয়কে এখানে আলোচনা করছে না। আর দেশের গরিষ্ঠ ভাগ বাঙালি অঞ্চলে লকডাউন, বিচ্ছিন্নতা ও সঙ্গনিরোধ সমানভাবে পালিত না হওয়ার একটি বড় কারণ হলো বিগত মহামারির স্মৃতি ও লোকবিধিচর্চা থেকে ধারাবাহিক বিচ্ছিন্নতা। তাই মার্চ থেকে জুলাই ২০২০—এই পাঁচ মাসে দেখা যায় দেশের আদিবাসী অঞ্চল ও সমাজে করোনার সংক্রমণ এবং করোনাজনিত কারণে মৃত্যু বাঙালি অঞ্চলের চেয়ে অনেক কম। অধিকাংশ অঞ্চলে একেবারেই কোনো সংক্রমণ বা উপসর্গও দেখা যায়নি। তার মানে মহামারি সামালে আদিবাসী সমাজের সামাজিক সুরক্ষাবিধি, খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মগুলো বৃহত্তর সমাজের জন্য মহামারি সামালের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কোনো নির্দেশনা ও সমাধান দিতে পারে। এ নিয়ে বিস্তর বহুপাক্ষিক অংশগ্রহণমূলক গবেষণা ও বিশ্লেষণ জরুরি। কোভিড-১৯সহ মহামারি সামাল দেওয়ার সামগ্রিক বৈশ্বিক পরিকল্পনা ও বিধিব্যবস্থায় আদিবাসী সমাজের বিধি ও জ্ঞানকাণ্ডের স্বীকৃতিসহ যুক্ততা জরুরি।

প্রকৃতির অসুস্থতাই মানুষের সমাজে 'রোগ' হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই রোগ ক্রমান্বয়ে 'অসুখ' ও 'মহামারি' তৈরি করে। রোগের সঙ্গে উপনিবেশ আর উন্নয়নের

এক গভীর যোগসূত্র আছে। কলম্বাস যেমন রেড ইন্ডিয়ানদের আমেরিকায় নানা রোগব্যাধি নিয়ে গিয়েছিলেন, এই বাংলাতেও উপনিবেশকালে বহিরাগতদের মাধ্যমে ঘটেছে নানা রোগের বিস্তার। মানুষের লাগামহীন চলাচলই রোগের সংক্রমণকে মহামারি করে তোলে। চলতি করোনাকালেও বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়েছে দেশের বাইরে থেকে আসা মানুষের মাধ্যমেই। যখন দেশে প্রথম রেললাইন হলো, বাড়ল ম্যালেরিয়া। একইভাবে দেশে কয়েক বছরে মেট্রোরেলসহ দশাসই সব উন্নয়ন প্রকল্প ডেঙ্গু কি চিকুনগুনিয়ার বিস্তার বাড়িয়েছে। আবার এই রোগের বিস্তার ও সংক্রমণ রোধে তৈরি হয় রাষ্ট্র বা বহুজাতিক কোম্পানির নানা কর্তৃত্ব। দরিদ্র মানুষের শরীর হয়ে ওঠে নতুন প্রতিষেধক-বাণিজ্যের বায়োমেডিকেল গবেষণার মাঠ। কোনো মহামারি কেবল মৃত, সুস্থ বা আক্রান্ত মানুষ বা ভূগোলের পরিসংখ্যানমাত্র নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানামুখী শঙ্কা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, অনাস্থা, আহাজারি, গুজব, আতঙ্ক বা আশার হাতছানি। মহামারি অনেক কিছু বদলে দেয়, তছনছ করে ফেলে। পারিবারিক গল্পের আঙিনা থেকে হাটবাজার, কারখানা থেকে উৎপাদন, ব্যক্তিগত অভ্যাস থেকে রাষ্ট্রনীতি, স্থাপত্য পরিকল্পনা থেকে বৈশ্বিক কর্তৃত্ব। কলেরা বা কালাজ্বর, বসন্ত বা ম্যালেরিয়ার কালে আমাদের গ্রাম-জনপদে বহু নিম্নবর্গীয় সুরক্ষার চল ঘটেছিল।

আমরা মহামারিকে সমষ্টির অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই দেখেছি। এককভাবে ব্যক্তির রোগ নয়, মহামারি থেকে গ্রামের সুরক্ষা দিতে লড়াইয়ের নজির আমাদের আছে। আমরা কেন করোনাকালে আমাদের মহামারি সামাল দেওয়ার সেই সব সমষ্টিগত অভিজ্ঞতাকে স্মরণে আনতে পারছি না? এমন স্মৃতিবিমুখ প্রজন্ম কেন হয়ে উঠছি আমরা? মহামারিকালে 'রোগ' এমন সব সামাজিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বাহিত হয়, যখন তার স্থানীয় লোকায়ত পরিচয় ও পরিধি নির্মিত হতে থাকে। ওলাউঠা নামের এক রোগে ভুগত গ্রামবাংলার মানুষ। ১৮ শতকে এই ওলাউঠা রোগটিই বিশ্বব্যাপী কলেরা নামে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। কলেরার বিস্তার ঠেকাতে অনেক গ্রামে ওলাবিবি/ওলাইচণ্ডী/ওলা দেবীর থান গড়ে উঠেছিল। ওলা দেবীর পূজা, মাগন ও মানত হতো সেখানে। এমনকি গুটিবসন্ত ঠেকাতেও গ্রামীণ নিম্নবর্গ শীতলা দেবীর থান তৈরি করেছে। শীতলা দেবীর সারা গায়ে গুটিবসন্তের দাগ। কোনো গ্রামে ওলাউঠা কি গুটিবসন্ত ছড়িয়ে গেলে মানুষ 'গ্রাম বন্ধ' করে দিত কিছুদিনের জন্য। বাইরের কেউ গ্রামে ঢুকতে পারত না, গ্রামের কেউ বেরোতে পারত না। টানা কয়েক বছর এমন অভিজ্ঞতার ফলে মৌসুমভিত্তিক রোগ সামাল দেওয়ার জন্য গ্রামবাংলার মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতিও গড়ে উঠেছিল।

টাঙ্গাইলের শালবন এলাকায় আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শুরুতে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে কালাজ্বর। রোগের সংক্রমণ কি মহামারির বিপদ থেকে গ্রামকে বাঁচাতে মান্দিরা 'দেনমারাংআ'পূজার আয়োজন করতেন। কোচ, বর্মণ,

রাজবংশীদের ভেতরেও অসুখের বিপদ থেকে গ্রামের সুরক্ষায় প্রতিবছর কয়েক দিনের জন্য গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে 'গেরামপূজা' ও 'কামাখ্যা'পূজা আয়োজনের রেওয়াজ আছে। খাগড়াছড়ির পাহাড়ে দেখেছি ত্রিপুরা আদিবাসীরা 'ম্যালেরিয়ার' বিস্তার রোধে 'সুকুন্দ্রায়-বুকুন্দ্রায়'পূজার সময় গ্রামকে 'শুদ্ধ' করতে চলাচল সীমিত করেন। নাটোরে পাহাড়িয়াদের গ্রামে বসন্ত ও মহামারি সামাল দেওয়ার জন্য সামাজিক 'পুন্টাডি'কৃত্যেও দেখেছি কত গভীরভাবে মহামারি থেকে বাঁচার সামাজিক সুরক্ষা প্রার্থনা করা হয়। সাঁওতালদের 'বাহা' কিংবা ওঁরাওদের 'ফাগুয়া' কী মুন্ডাদের 'সারুল' পরবেও অসুখ থেকে বাঁচার সামাজিক সুরক্ষা প্রার্থনার আয়োজনগুলো দেখা হয়েছে। মহামারির বিস্তার ও সংক্রমণ ঠেকাতে নিজেদের এলাকাকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করা বা নানাবিধ সঙ্গনিরোধের বহু নজির আমাদের নিম্নবর্গের অভিজ্ঞতা ও আখ্যানে আছে।

চলতি আলাপে 'আদিবাসী' প্রত্যয়টি 'আত্মপরিচয়ের অধিকার' মান্য করে ব্যবহৃত হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী', 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী', 'ট্রাইবাল' পরিচয়ে অভিহিত ১৬ কোটি মানুষের দেশে আদিবাসী জনগণ ৩০ লাখ। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০-এর ২(১) এবং ধারা ১৯-এ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখোয়া, চাক, খিয়াং, খুমি, লুসাই, কোচ, সাঁওতাল, ডালু, উসাই (উসুই), রাখাইন, মণিপুরি, গারো, হাজং, খাসিয়া, মং, ওঁরাও, বর্মণ, পাহাড়ি, মালপাহাড়ি, কোল ও বর্মণ নামের মোট ২৭ জনগোষ্ঠীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্বের ২৭ আদিবাসী জাতির পাশাপাশি বর্তমানে কুর্মি মাহাতো, কন্দ, গঞ্জু, গড়াইত, মালো, তুরি, তেলী, পাত্র, বানাই, বাগদী, বেদিয়া, বড়াইক, ভূমিজ, মুসহর, মাহালী, রাজোয়ার, লোহার, শবর, হদি, হো ও কড়া—এই ২১ আদিবাসী জাতির নাম পরবর্তীকালে তফশিলভুক্ত হয়।

সাধারণভাবে দেশের আদিবাসীদের অনেকে 'সমতল' ও 'পাহাড়ের' এভাবে ভাগ করেন। আবার বিদ্যায়তনিকভাবে 'মঙ্গোলয়েড' ও 'অস্ট্রালয়েড'—এ রকম ভাগও আছে। করোনাকালীন চলমান এই গবেষণার আলোকে দেখতে পেয়েছি, তুলনামূলকভাবে দেশের 'মঙ্গোলয়েড' আদিবাসী জাতিগুলোর ভেতর মহামারির স্মৃতি ও বিধি পালনের চর্চা এখনো প্রবল। এই জাতিগুলোকে আগের অনেক মহামারি সামাল দিতে হয়েছে তুলনামূলকভাবে 'অস্ট্রালয়েড' আদিবাসীদের চেয়ে বেশি। যেমন 'মঙ্গোলয়েড' আদিবাসী জাতিদের ভেতর মহামারি, লকডাউন, বিচ্ছিন্নতা, সঙ্গনিরোধবিষয়ক সুস্পষ্টবিধি ও এসবের নিজস্ব নাম পাওয়া যায়। 'অস্ট্রালয়েড' আদিবাসী জাতিদের ভেতর মহামারি সামালের প্রার্থনা, পূজা ও কৃত্যের চল থাকলেও সুরক্ষাবিধির বৈচিত্র্য ও নিজস্ব শ্রেণিকরণ তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি দেখা গেছে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিদের ভেতর কলেরা ও গুটিবসন্ত মহামারি সামালের সাম্প্রতিক স্মৃতি আছে। কিছু এলাকায় কিছু জাতির ভেতর কালাজ্বর ও হামও মহামারি

পরিস্থিতি তৈরি করেছিল বলে জানা যায়। লকডাউন-সঙ্গনিরোধ-সাময়িক বিচ্ছিন্নতা—বিশেষ খাদ্যাভাস ও লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসাসম্পর্কিত মহামারি সামালের আদিবাসী স্বাস্থ্যবিধিগুলো 'সুপ্রাচীন' এবং এসব বিধি মূলত জাতিগুলোর ভেতর প্রচলিত আদি ধর্মদর্শনের সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কিত, বিদ্যায়তনে যে ধর্মবিধানগুলো 'সর্বপ্রাণবাদীর' মতো একটি একক প্রত্যয়ে ব্যবহৃত হয়। দেখা গেছে অধিকাংশ জাতি ও অঞ্চলে মহামারি সামালের স্বাস্থ্যবিধিগুলো করোনা মহামারিকালে আবারও 'লকডাউন-সাময়িক বিচ্ছিন্নতা-বিশেষ খাদ্যাভাস এবং কিছু বিশেষ কৃত্য' হিসেবে পুনঃ চর্চার চল শুরু হলেও এসব আদি বিধি ও বিধিসম্পর্কিত দর্শন এবং ভাষিক অনুষঙ্গের প্রচলন নতুন প্রজন্মের কাছে 'প্রায় অনুপস্থিত'। সামগ্রিকভাবে তাই দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি আদিবাসী জাতির মহামারি সামালের আদি স্বাস্থ্যবিধির প্রচলন থাকা সত্ত্বেও জোরদারভাবে 'আদিবাসী আত্মপরিচয় প্রশ্নের' ময়দান থেকে এই জ্ঞানভাষ্যের স্বীকৃতি বা রাষ্ট্রীয় সংযোগের দাবিতে জোরদার কোনো বাহাস ওঠেনি। চলতি আলাপে বাংলাদেশের ৩১টি আদিবাসী জাতিসত্তার মহামারি সামালের বিধি ও পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত হলো।

১. দেনমারাংআ

অসুখ ও নানা রোগের সংক্রমণ সুরক্ষায় মান্দি বা গারো সমাজে বৈচিত্র্যময় পূজাকৃত্য আয়োজিত হতো 'সাংসারেক (আদি মান্দি ধর্ম)' নিয়মে। তবে মহামারির ধারণাটি রোগের সাধারণ সংক্রমণ বা বিপদ হিসেবে মান্দি ইতিহাসে দেখা হয় না। যদি কোনো রোগের সংক্রমণ সব দিকে ছড়িয়ে যায়, সব জাতির সব মানুষ, রাজা থেকে প্রজা—সবাই আক্রান্ত হয় এবং মানুষের অবিরাম মৃত্যু ঘটতে থাকে, তবে সেই পরিস্থিতিকে মান্দিরা বলতেন 'সিগ্রেমা'। সিগ্রেমা মানে মহামারি। সিগ্রেমার বিপদ থেকে বাঁচতে মান্দিরা প্রথমত গ্রামভিত্তিক সুরক্ষা নেন। গ্রামে সামাজিকভাবে 'দেনমারাংআ' আমুয়ার (পূজা) আয়োজন করা হয়। গ্রামের প্রবেশের পথগুলো মাটি-শণ দিয়ে কয়েক স্তর উঁচু করে বন্ধ করে দেওয়া হতো। একে 'কুশি' বলে। যখনই কোথাও অসুখ বা মহামারি ছড়িয়ে পড়ত, তখনই গ্রামে বহিরাগত লোকজনের সব প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যেত এবং গ্রামের লোকজনও বেশ কিছুদিন গ্রাম থেকে বাইরে বেরোতেন না। মহামারি সামালে গ্রামের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়াকে মান্দি ভাষায় বলে 'রামা দেংচেংআ' এবং সামগ্রিকভাবে গ্রাম বন্ধ করাকে বলে 'সঙ দেংচেংআ'। এরপর গ্রাম থেকে গ্রাম পুরো অঞ্চলের সুরক্ষায় 'খেলদেং গেচ্ছাক থাদেগা' করা হয়। প্রতিটি গ্রামে প্রবেশের রাস্তায় রাস্তায় কার্পাস তুলার লাল রঙের সুতা টানানো হয় এবং রাস্তাগুলো আটকে দেওয়া হয়। এ রকম হলে বুঝতে হবে, পরিস্থিতি খুব বিপজ্জনক। যদি কেউ লাল সুতা ছিঁড়ে ফেলে বা কোথাও অনধিকার প্রবেশ করতে চায়, তবে তার নিজের সংক্রমণ হতে

পারে বা তার গ্রামে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমন হলে সেই ব্যক্তিকে আর গ্রামে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। গ্রামের বাইরে জঙ্গল এলাকায় বা জুমের মধ্যে বুরাংঘরে তাকে কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে হয়। যদি তার ভেতর কোনো লক্ষণ না দেখা যায়, তবে তাকে গ্রামে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

২. নকনিওয়াই ও কামাখ্যা

কোচ আদিবাসীরা সচরাচর কলেরা ও বসন্ত মহামারি সামাল দেওয়ার জন্য নানাবিধ সামাজিক বিধি মেনে চলেন। তবে মহামারি সামালের ক্ষেত্রে বিধি ও কৃত্যগুলো ভিন্ন হয়ে যায়। কোচ ভাষায় মহামারিকে বলে 'মালাংনি'। এ ক্ষেত্রে শেরপুর, গাজীপুর ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে কৃত্যগত ভিন্নতা দেখা যায়। যদি কোথাও মহামারি শুরু হয়, তবে শেরপুর অঞ্চলের কোচ সমাজ সামাজিকভাবে 'নকনিওয়াই'পূজার আয়োজন করে। এই পূজায় তিনজন নারী সামগ্রিক কৃত্যটি পরিচালনা করেন। গ্রাম থেকে বাছাই করে লম্বা বাঁশ আনা হয় এবং মাটিতে দুটি করে বাঁশ পোঁতা হয়। বাঁশের গোড়া থেকে মাথার দিকে প্রায় ৪ মিটার লম্বা একধরনের সুতায় বোনা 'জাল' লাগানো হয়। বাঁশের গোড়ায় পোড়াবিন্নি চালের গুঁড়া (বারান্দি) দিয়ে ফাপমুডা (আলপনা) আঁকা হয়। এর ওপর কলাপাতার তৈরি 'খালায়' (থালা) বিছানো হয় সারিবদ্ধভাবে। একটি পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়। এটি পারিবারিকভাবে আয়োজিত হয় এবং বংশ ও গোত্রের আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। পরবর্তীকালে একটি সামাজিক ভোজ আয়োজিত হয়। নকনিওয়াই কৃত্যে মহামারি থেকে সুরক্ষার সামাজিক প্রার্থনা করা হয়। তিন দিন পর উঠানে পোঁতা বাঁশগুলো তুলে ফেলা হয়। অপর দিকে গাজীপুর অঞ্চলে কোচ ও বর্মণদের ভেতর বসন্ত রোগ না হওয়ার জন্য সামাজিকভাবে শীতলাপূজা এবং মহামারি সামালে সামাজিকভাবে কামাখ্যাপূজার আয়োজন হয়। টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলে কোচদের ভেতর অসুখের বিপদ থেকে গ্রামের সুরক্ষায় প্রতিবছর কয়েক দিনের জন্য গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে 'গেরাম পূজা' আয়োজনের রেওয়াজ ছিল। মহামারির সময় নিয়ম করে সবাইকে জানিয়ে পাড়া ও গ্রাম বন্ধ করে দেওয়া হতো এবং বহিরাগতদের প্রবেশ সীমিত করা হতো। কোচ ভাষায় এই গ্রাম বন্ধ প্রথাকে বলে 'চিংয়ে হারিকু খাই চিয়ে আ'।

৩. প্রারাই ত্ররা

প্রতিটি রাখাইন পাড়ায় একটি পবিত্র এম্প্যা (বৃক্ষ) থান থাকে। এখানে 'চোয়াইসেন মা এম্প্যার'পূজা করা হয়। অসুখ ও মহামারি থেকে বাঁচতে রাখাইনরা সামাজিকভাবে 'চোয়াইসেন মা এম্প্যা'পূজার আয়োজন করেন। রাখাইন ভাষায় মহামারিকে 'রিনাহ্ রগা' বলে। এ সময় পাড়ায় মানুষের প্রবেশ ও যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীকালে

পাড়ায় প্রতিটি বাড়ি কার্পাস তুলার সুতা দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় এবং পূজার মঙ্গল পানি ছিটিয়ে পরিচ্ছন্ন করা হয়। এভাবে মহামারি সামাল দিতে রাখাইনরা 'প্রারাই ত্রুরা' বিধির মাধ্যমে মহামারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুদিনের জন্য পাড়া বন্ধ করে দেন। কঠিন অসুখ ও মহামারিতে কেউ মারা গেলে বা গ্রামের বাইরে কেউ মারা গেলে রাখাইনদের ভেতর সেই মৃত ব্যক্তির সৎকারে কঠিন সামাজিক বিধি পালিত হয়। প্রতিটি রাখাইন পাড়ায় দুই ধরনের ত্যান্সায় বা শ্মশান থাকে। এনঙ্গাদু ত্যান্সায় বা অতিথি শ্মশান এবং রওয়া ত্যান্সায় বা পাড়ার শ্মশান। রোগের সংক্রমণ ও মহামারিতে মৃত ব্যক্তিদের সৎকার থেকেই এই বিশেষ স্থাপনার চল হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি পাড়া বা গ্রামের বাইরে মারা যান, তবে মৃতদেহকে গ্রামের বাইরে শ্মশান বা বিহার থেকে নিরাপদ দূরত্বে তৈরি অস্থায়ী ঘরে সৎকারের আগ পর্যন্ত রাখা হয়। শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা শেষে মৃতদেহকে 'এনঙ্গাদু ত্যান্সায়' শ্মশানে সৎকার করা হয়। মৃতের ব্যবহৃত বস্ত্র, কাপড় ও তার স্পর্শে আসা সবকিছু পুড়িয়ে ফেলা হয়। গ্রামের বাইরে বা রোগের সংক্রমণে মৃত ব্যক্তিদের শেষকৃত্যে অংশগ্রহণকারীদের ঘরে ফেরার আগে গ্রামের বাইরের পুকুরে ভালো করে স্নান করতে হয়। ঘরের সামনে হলুদ মেশানো পানি এবং আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। হলুদ-পানিতে হাত-পা ধুয়ে এবং আগুনে সেঁকে তারপর ঘরে প্রবেশ করতে হয়। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিহারের একটি ঘরে আলাদা থাকতে হয় সাত দিন। তবে এই রীতি কক্সবাজার অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও বরিশাল অঞ্চলে এখন পালিত হয় না।

৪. আভাং আখো

মহামারিকে আদিবাসী খুমি ভাষায় বলে 'কাংহয়'। এই সংকট সামাল দিতে বান্দরবানের খুমিরা প্রথমত আশপাশের সব গ্রাম ও পাড়া থেকে নিজেদের পাড়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তারপর নিজেদের পাড়ার প্রবেশপথগুলোতে বাঁশের তৈরি কাঁটার বেড়া তৈরি করে সব প্রবেশপথ বন্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিকে খুমি ভাষায় 'আপাই চিমিউ' বলে। মহামারিকালে কেউ এসব কাঁটা বাঁশের বেড়া দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। তবে কোনো জরুরি প্রয়োজনে কেউ যদি পাড়ায় প্রবেশ করতে চায় বা কেউ যদি পাড়া থেকে বের হয়ে আবার ঢুকতে চায়, তবে বেড়ার কাছে জ্বালানো আগুনে হাত-পা খুব ভালো করে সেঁকে তারপর তাকে পাড়ায় ঢুকতে হয়। মহামারিকাল এভাবে পাড়া বন্ধ করাকে খুমি ভাষায় বলে 'আভাং আখো'।

৫. ডুব আং

মহামারিকে ম্রো ভাষায় বলে 'হয়'। বান্দরবানের পাহাড়ি এলাকায় ম্রোদের ভেতর অসুখ ও মহামারি থেকে বাঁচার জন্য গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার যে কৃত্য পালিত

হতো, একসময় তার নাম ছিল 'ডুব আং', মানে মহামারি থেকে বাঁচতে সামাজিকভাবে পালিত কৃত্য। আশপাশে কোথাও মহামারির বিস্তার হলে গ্রামের লোকেরা একত্র হয়ে কিছুদিন গ্রামকে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রস্তুতি নিতেন। পাড়ার লোকজন প্রতিনিয়ত জঙ্গলের যে ঝিরি-ছড়া ব্যবহার করেন, সেখানে এই কৃত্য পালিত হয়। এই ঝিরি থেকে ভোরবেলা স্নান সেরে তুলে আনা হতো ছোট ছোট পাথর। এই সব পাথরে মহামারি তাড়ানোর মন্ত্র লেখা হতো সুইয়ের আঁচড়ে। গ্রামের সবাই কার্পাস তুলার সুতা দিয়ে গ্রামের চারধারে বাঁধন দিতেন। গ্রামের সব প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হতো। প্রতিটি প্রবেশপথে মাটির তলায় গুঁজে রাখা হতো মন্ত্রপূত পাথর। 'ডুব আং' কৃত্যের মাধ্যমে পাড়া বা গ্রাম বন্ধ করাকে ম্রো ভাষায় বলে 'খাং কোয়া'।

৬. খাং চোনং

নেত্রকোনার কলমাকান্দা সীমান্তে মাতৃসূত্রীয় লেঙাম আদিবাসীদের ভাষায় মহামারি মানে 'ঙিয়াপখ্লাম'। অসুখ ও মহামারি থেকে সুরক্ষা পেতে গ্রামের সবাই মিলে গ্রাম বন্ধ করে দেন। গ্রামে প্রবেশের সব রাস্তায় টুকরা পাথর রাখা হয়। এ সময় গ্রামের চারধারে ঝরনা থেকে আনা মন্ত্র পড়া পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। যত দিন গ্রাম বন্ধ থাকে, তত দিন গ্রামের বাইরে কোথাও কেউ যায় না এবং গ্রামেও কেউ প্রবেশ করতে পারে না। মহামারিকালে গ্রাম বন্ধ করে দেওয়াকে লেঙাম ভাষায় বলে 'খাং চোনং বাই ঙিয়াপখ্লাম'। লেঙামদের ভেতর আদি রীতিতে দুভাবে মৃতদেহ সৎকার করা হতো। মৃত্যুর পর মৃতদেহকে একটি বড় গাছের শীর্ষে রেখে দেওয়া হতো, তারপর কিছুদিন পর তার হাড়গুলো থেন্নাং (দাহ) করা হতো। আবার অন্য রীতিটি হলো সরাসরি থেন্নাং। মহামারিতে কেউ মারা গেলে তাকে গ্রাম থেকে দূরে সরাসরি থেন্নাং করা হতো এবং যাঁরা এই কাজে অংশ নিতেন, তাঁদের সবাইকে স্নান করে আগুনে হাত-পা সেঁকে ঘরে ফিরতে হতো। মৃতদেহের ভস্ম আলাদাভাবে জড়ো করে দূরে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হতো। সেখানে কয়েকটি বড় পাথর বিশেষভাবে রাখা হতো এলাকাটি চিহ্নিত করার জন্য।

৭. খোয়া খার

রাঙামাটি ও বান্দরবানের পাংখোয়া আদিবাসীরা মহামারিকে বলে 'রি-পুই'। পাংখোয়ারা বড় ধরনের অসুখ ও মহামারি সামাল দিতে নানা কৃত্য পালন করতেন একসময়। ঝিরি থেকে ছোট পাথর সংগ্রহ করা হয় এবং এই পাথরে মহামারির বিরুদ্ধে মন্ত্র আঁকা হয়। পাংখোয়া ভাষায় এই কৃত্যকে 'লুংতেরঙেট ইন তোয়ালে রিত' বলে। এরপর শুরু হয় গ্রাম বন্ধের কাজ। পাংখোয়া ভাষায় একে 'খোয়া খার' বলে। খোয়া খারের সময় ঘরে বহিরাগত কেউ গ্রামে ঢুকতে পারে না, গ্রাম থেকে

কেউ বাইরেও যেতে পারে না। এমনকি গ্রামের ভেতরেও যারা থাকে, তাদেরও ঘরে প্রবেশের পূর্বে ঘরের সামনে জ্বালানো আগুনে হাত-পা সেঁকে ঘরে ঢুকতে হয়। পাংখোয়া ভাষায় এই রীতিকে বলে 'মেই রাকান'।

৮. থাংমানা/থাম্মানা

মহামারিকে চাকমা ভাষায় বলে 'ডঙ্গা পিড়ে'। তবে কোথাও 'সিধিলে পিড়ে' নামটিও বলতে শোনা যায়। মহামারিকালে অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটে বলে চাকমারা অনেকে এই পরিস্থিতিকে 'বেজেমরা' হিসেবে বলে থাকেন। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় চাকমারা সামাজিকভাবে 'থাংমানা/থাম্মানা'পূজার আয়োজন করেন। মহামারি থেকে কিছুদিনের জন্য গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাকে চাকমা ভাষায় বলে 'আদাম বন গরানা'। গ্রামে প্রবেশের যতগুলো পথ আছে, পথের মোড়ে মোড়ে বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় সবাই গ্রামেই থাকেন এবং চাকমা তালিকশাস্ত্র অনুযায়ী পাহাড়ি বৈদ্যদের কাছ থেকে নানা ভেষজ চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া 'একঘজ্যা গরানা'ও সামাজিকভাবে পালিত হয়।

৯. কেরপূজা

মহামারি বোঝাতে ত্রিপুরাদের ককবরক ভাষায় অনেক প্রত্যয় নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'হুনা', 'নবার কুতুং', 'হাইঞা হামিয়া' কিংবা 'থৈ ক্রং থৈক্রু'। তবে কঠিন ও খারাপ অসুখের মাধ্যমে মহামারি তৈরি হলে তাকে বলা হয় 'হাইঞা হামিয়া'। ত্রিপুরাদের ভেতর অসুখ ও মহামারি থেকে বাঁচতে 'কেরপূজার' আয়োজনের চল আছে। কেরপূজার আগের দিন নানা নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন পাহাড়ি শাকসবজি ও ঘরে তৈরি পানীয়—সবকিছু ঘরের বাইরে এনে রাখতে হয়। এই নিয়মগুলো গ্রামের সবাইকে পালন করতে হয়। মহামারি থেকে সুরক্ষায় গ্রামের সবাই কিছুদিন গ্রামেই বসবাস করতেন। তারপর মহামারি থামলে সবাই মিলে ছড়ার পাড়ে গিয়ে 'বারিনি মাতাইপূজা' আয়োজন করতেন। কেরপূজাতে গাজীকালুর কৃত্যও পালন করা হয়। মহামারিকালে ত্রিপুরাপাড়াতে যাতায়াত ও চলাচল সীমিত করতে সাময়িক সময়ের জন্য পাড়ার সব প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ত্রিপুরারা একে বলেন 'কামি নি লামা মুথুকজাক/মুথুপজাক'।

১০. কারহাড় পাটেত

ফৌগুন (ফাল্গুন) মাস থেকেই শুরু হয় সাঁওতালি বর্ষ। বর্ষবিদায় ও বরণের উৎসব বাহাও পালিত হয় এ মাসেই। এ সময় গাছে গাছে সারজম, ইচৌক, মুরুপ্ আর মহুয়া ফুল ফোটে। বাহা পরবের ভেতর দিয়েই সাঁওতাল সমাজ এসব ফুলের মধু

পান ও ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে প্রকৃতির কাছে। বাহার আগে এসব ফুলের ব্যবহার সামাজিকভাবে নিষেধ। বাহা পরবে রোগ-জরা নিরাময়ে নতুন ফুলের স্পর্শ গ্রহণের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করে সাঁওতাল সমাজ। মহামারিকে সাঁওতালি ভাষায় বলে 'মারাংনাস'। প্রতিটি সাঁওতাল গ্রামে থাকে পবিত্র জাহেরথান ও মৌঞ্জহি থান। উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল গ্রামে মহামারি থেকে গ্রামের সুরক্ষায় জাহেরথান ও মৌঞ্জহি থানে পবিত্র পানি ঢেলে প্রার্থনা জানানো হয়, যাতে এই মহামারি গ্রামে প্রবেশ না করে। সাঁওতালি ভাষায় এ কৃত্যের নাম 'মৌঞ্জহিথানে দা : দুল'। তারপর গ্রামের মৌঞ্জহি পরিষদ সবাইকে নিয়ে পারিবারিক নিয়ম পালন ও যাতায়াত সীমিত করার নির্দেশনা দেন। প্রথমত পারিবারিকভাবে এবং কয়েকটি ঘর মিলে 'কারহাড় পাটেত' করা হয়।

মহামারি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি খুবই কঠোর পালনীয় বিধি। এ সময় প্রবেশ, চলাচল সবকিছু বন্ধ করা হয়। বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে পারিবারিক সঙ্গনিরোধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ছাড়া একই সঙ্গে বড় পরিসরে গ্রামের ভেতর চলাচল সীমিত করতে গ্রাম বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাঁওতালি ভাষায় একে বলে 'আতো কুলুপ'। আতো কুলুপ এমনিতেও নানা বিপদ বা সংকট সমাধানে অনেক সময় সাময়িকভাবে করা হলেও কেবল মহামারিকালেই 'কারহাড় পাটেত' কঠোরভাবে পালিত হয়। তবে সচরাচর বসন্ত ও কলেরা থেকে সুরক্ষায় সাঁওতাল গ্রামে ঐতিহ্যগতভাবেই 'জাগেঁ দাড়াম' পদ্ধতিতে গ্রাম লকডাউন করার নিয়ম। এমনিতেই সাঁওতাল সমাজে শারীরিক দূরত্ব ও সঙ্গনিরোধ মানে নানা সামাজিক কৃত্যের আদি চল আছে। সাঁওতাল বাড়িতে কোনো অতিথি এলে তাঁকে আলাদাভাবে খাটিয়া, মাচুলি বা মাদুরে বসতে দেওয়া হয় কিছু সময়, সাঁওতালি ভাষায় একে বলে 'ডব-জোহার'। তারপর লোটা থেকে অতিথির পায়ে জল ঢেলে পা ধুয়ে দেওয়া হয়। একে সাঁওতালি ভাষায় বলে 'লোটা-দা'। হাত বা বুক মেলানো নয়, দূর থেকে হাঁটু গেড়ে বসে কাউকে অভিবাদন বা সম্ভাষণ জানানো সাঁওতাল সমাজের রীতি।

১১. খাং খারদেপ সোনং

সিলেট বিভাগের আদিবাসী খাসি ভাষায় মহামারি মানে হলো 'ইয়াপখ্লাম'। মহামারি থেকে সুরক্ষা পেতে খাসি সমাজে জেন্টিল বা নিয়াম তেনরাইমতে (আদি খাসি ধর্ম) 'কাইনিয়া ছোনং বা রিম ছোনং'পূজা করা হতো। খাসিদের ভেতর মহামারি বা বড় অসুখের আগে নিজেদের পুঞ্জি (গ্রাম) বন্ধের রীতি আছে। এ সময় পুঞ্জির সব প্রবেশপথ বহিরাগতদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুঞ্জিতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা নিয়ম মেনে স্নান সেরে পানজুমে যান এবং ফেরার পর স্নান করে ঘরে ঢোকেন। নারীরা পুঞ্জির সীমানার ভেতরে পাহাড়ি জঙ্গল থেকে শাকলতা কুড়িয়ে আনেন।

মহামারি সামালের এই গ্রামবন্ধ প্রক্রিয়াকে খাসি ভাষায় বলে 'খাং খারদেপ ছোনং বাহ ইয়াপখ্লাম'।

১২. শিবথানপূজা

দিনাজপুরের বিরলের আদিবাসী কড়া গ্রামে পবিত্র শিবথান থাকে। কোনো অসুখ বা মহামারি সামাল দিতে পাড়ার সবাই মিলে সেখানে পূজা দিতে যান। মহামারি পরিস্থিতিকে কড়ারা বলেন 'দুর্দশা'। দুর্দশা দূর করতে সাধারণত রোববার দিন সন্ধ্যার পর সামাজিকভাবে শিবথানপূজা আয়োজিত হয়। পূজার আগে ও পরে নিয়ম করে পরিবারভিত্তিক নানা পরিচ্ছন্নতার নিয়ম পালন করা হয়। পাড়ার কাছাকাছি কোথাও সংক্রমণ ঘটলে তাঁরা নিজেদের পাড়ার সব প্রবেশপথ বাঁশ ও গাছের ডাল দিয়ে বন্ধ করে দেন, এটিকে কড়ারা বলেন 'বাঁধ দেওয়া'। কড়া আদিবাসীরা চৈত্রসংক্রান্তিতে আয়োজন করেন চইতবিশমা। এটিও অসুখ-জরা থেকে বাঁচতে বাৎসরিক পার্বণ। সংক্রান্তির কয়েক দিন আগে থেকেই পাড়া-গ্রাম পরিচ্ছন্ন করা হয়, বহিরাগতদের গ্রামে প্রবেশ সীমিত করা হয়। চইতবিশমার দিনে নিমপাতার কাঁচা রস ও নানা পদের তিতা শাক খাওয়া হয়। পেঁয়াজ-রসুন-শুকনা মরিচ ঝোলানো হয় ঘরের দরজায়। কড়াদের প্রতিটি বাড়িতে পিড়াঘার নামে এক পবিত্র পূজাস্থল থাকে। এখানে চইতবিশমাপূজা শেষে হাঁড়িয়া পান ও নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়।

১৩. সারুল ও মাইথানপূজা

অসুখ, অশুভ শক্তি ও মহামারি থেকে গ্রামকে মুক্ত রাখতে মুন্ডাদের ভেতর অঞ্চলভিত্তিক কৃত্যরীতির ভিন্নতা আছে। সুন্দরবন অঞ্চলে বসন্তকালে মুন্ডারা পালন করেন সারুল/সারহুল কৃত্য। সুন্দরবন অঞ্চলে এ পূজায় সিদ্ধিগাছের (সুন্দরী) পাতা লাগে। মাটির থানে ও ঘরের ভেতর পূজা হয়। কৃত্যকালীন সময়ে কঠোরভাবে বহিরাগতদের গ্রামে প্রবেশ সীমিত করা হয়। তবে বরেন্দ্রভূমির মুন্ডারা অসুখ ও মহামারি সামাল দিতে আয়োজন করেন মাইথানপূজা। গ্রামে প্রবেশপথের জায়গায় বা উন্মুক্ত খিলানে মাইথান থাকত। বসন্ত বা কলেরা বা কোনো অসুখ থেকে পরিবার ও গ্রাম রক্ষা করতে এই মাইথানে পূজা হয়। আশপাশে মহামারি ছড়িয়ে গেলে গ্রামের মণ্ডল (গ্রামপ্রধান) গ্রামবাসীদের নিয়ে সর্বজনীন মাইথানের আয়োজন করেন। এই খবর গ্রামের পাহান (পুরোহিত) সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানান দেন। তারপর প্রতি পরিবার থেকে একজন প্রতিনিধি ধূপবাতি নিয়ে পূজার দিন মাইথানে যান। এখানে বেশি ভিড় করা যায় না। মাইথানে সবাই মহামারি থেকে গ্রামের সুরক্ষায় সমষ্টিগত প্রার্থনা করেন।

১৪. অঘনী, শাওনী, বাইশাখী ও শীতলাপূজা

মহামারি পরিস্থিতিকে রবিদাসরা বলে 'আকাল গিরালবা'। মহামারি থেকে বাঁচতে রবিদাস সমাজে কঠোর পরিচ্ছন্নতার নিয়ম পালন করা হয়। এ ছাড়া ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের রবিদাস সমাজে বছরব্যাপী ঋতুভিত্তিক নানা পূজাকৃত্য পালন করা হয় গ্রামকে অসুখ ও মহামারি থেকে রক্ষার জন্য। আগের দিনে গ্রামের উন্মুক্ত স্থানে অঘনী, শাওনী, শীতলা ও বাইশাখীপূজা সামাজিকভাবে পালিত হতো। পরবর্তীকালে রবিদাসপাড়ায় গড়ে ওঠা ধাম ও গৃহে নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ অন্নাস পাঠের চল শুরু হয়। রবিদাস ভাষায় একে বলে 'অন্নাস বন্দেগি'। এটি এখন শণপন্থীদের ভেতর বহুল প্রচলিত একটি রীতি। অসুখ ও মহামারি দেখা দিলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ঘর চিহ্নিত করা হয় ও সেই ঘরের সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা হয় এবং বাঁশ দিয়ে গ্রামের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোনো ঘরকে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করলে সেখানে সবাইকে যেতে বারণ করা হয়। এই বারণকে রবিদাসরা বলে 'উঘর না যায় পড়ি'।

১৫. গাওরাখলা আবইল্যা বনসোয়ে

বসন্ত, কলেরা ও অশুভ বিপদ থেকে বাঁচতে লালেং আদিবাসীরা ঘরের প্রবেশদ্বারে চালতা ফল ঝুলিয়ে রাখেন। তবে মহামারি দেখা দিলে সিলেটের লালেং বা পাত্র আদিবাসীদের ভেতর সামাজিকভাবে এবং বাড়ি বাড়ি 'সিতলিসেবার' প্রচলন এখনো আছে। বিশেষ করে বসন্ত রোগ দেখা দিলে সিতলিসেবা আয়োজন করা হয় এবং সাত দিন নিয়ম করে নিরামিষ খাবার গ্রহণ করতে হয়। সাত দিন পর নিমপাতা, জামিরা লেবুর পাতাসেদ্ধ পানি দিয়ে স্নান করা হয়। বাইরে থেকে রোগ সংক্রমণ যাতে গ্রামে না ঢুকতে পারে, তাই গ্রামের প্রবেশপথগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। দক্ষ লালেং কবিরাজ মন্ত্র পড়ে গ্রাম বন্ধ করে দেন। এই রীতিকে লালেংঠারে (লালেং ভাষায়) বলে 'গাওরাখলা আবইল্যা বনসোয়ে'।

১৬. প্লেংখাম

বান্দরবানের আদিবাসী বম ভাষায় মহামারি মানে 'পুলপি'। মহামারি দেখা দিলে বমরা আগে গ্রামে সামাজিকভাবে কিছু যুবককে ঠিক করত গ্রাম পাহারা দেওয়ার জন্য। তারপর সবাই মিলে গ্রাম ছেড়ে কিছুদিনের জন্য দূর পাহাড়ের জুমে চলে যেত। পাশাপাশি জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে এনে গ্রামে ও পাড়ায় প্রবেশের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হতো। এই পদ্ধতিকে বম ভাষায় বলে 'প্লেংখাম'। মহামারির সময় শুধু বুনো শাকসবজি সেদ্ধ খাবার খাওয়ার নিয়ম ছিল। তখন কোনো কিছুই একেবারে কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হতো না। বমদের স্বাস্থ্যবিদ্যা অনুযায়ী 'রিক' মানে

অদৃশ্য জীবাণু, যাকে চোখে দেখা যায় না। রিকের ফলেই নানা কঠিন রোগের সংক্রমণ ঘটে ও মহামারি পরিস্থিতি তৈরি হয়।

১৭. গাওগাঞ্জারী

নাটোর ও জয়পুরহাটের বেদিয়া মাহাতো আদিবাসীরা মনে করেন, খারাপ হাওয়া-বাতাস থেকেই কঠিন রোগের সংক্রমণ হয় এবং একসময় মহামারি হয়। অসুখ ও রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে বেদিয়া মাহাতোরা বাৎসরিক জশমীপূজার আয়োজন করেন। মাটির ভিটা তৈরি করে ছাগল ও মুরগি উৎসর্গ করে পূজা করা হয়। কিন্তু যদি মহামারি পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে সামাজিকভাবে গ্রামের মণ্ডলসহ সবাই সিদ্ধান্ত নেন কিছু সামাজিক কাজের। প্রথমে সামাজিকভাবে 'গাওগাঞ্জারী'পূজার আয়োজন করা হয়। মহামারির সময় বেদিয়া মাহাতোরা নিরামিষ ও তিতা স্বাদের শাক বেশি খান। যদি কোনো পরিবার ও গ্রামে সংক্রমণ ঘটে, তবে সেখানে সবার চলাচল সীমিত করা হয়।

১৮. চোবই

বান্দরবানের খিয়াং আদিবাসী ভাষায় মহামারিকে বলে 'লোগা/লগা'। মহামারিকে খিয়াংরা মনে করেন 'হ্রিদিল খ্রাহ', মানে পৃথিবীর ওপর মহাবিপদ। মহামারি থেকে সুরক্ষায় খিয়াংরা সামাজিকভাবে চোবইকৃত্য আয়োজন করেন। গ্রামের প্রতি বাড়ি থেকে মেইপক (ধানের খই) সংগ্রহ করা হয় এবং খই, কলা, দুধ, চিনি নিয়ে নদীর ধারে এই কৃত্য পালিত হয়। চারটি লম্বা বাঁশ দিয়ে নদীর তীরে একটি কাঠামো বানানো হয়, যাকে 'চোবই' বলে। চোবইকৃত্যের দিন গ্রাম বন্ধ করে দেওয়া হয়। চোবইয়ের এক সপ্তাহ পর দুটি ছাগল উৎসর্গ করে সামাজিক ভোজ গ্রহণের মাধ্যমে পাড়া বন্ধ করা হয়। একে খিয়াং ভাষায় 'হেনেই' বলে। এ সময় পারিবারিকভাবে ও পাড়াগতভাবে কতগুলো সুরক্ষাবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য সবাইকে আহ্বান জানানো হয়। মহামারিকালে তেলজাতীয় কোনো খাবার খিয়াংরা গ্রহণ করে না। এমনকি কাঁচা ফলমূলও নয়। সব ধরনের খাবার সেদ্ধ করে খাওয়া হয়।

১৯. খুয়া যারহ

বান্দরবান ও রাঙামাটির লুসাই আদিবাসী ভাষায় মহামারি হলো 'হ্ম পুই'। মহামারি পরিস্থিতিতে লুসাইরা আগের দিনে গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে গভীর বনে চলে যেতেন। এই রীতিকে লুসাই ভাষায় বলে 'রাম নুয়াই আহ আন ভ্লান'। পরবর্তীকালে লুসাইরা নিজেদের পাড়া ও গ্রামে বহিরাগত ও আশপাশের মানুষের চলাচল সীমিত করতে গ্রাম বন্ধ করে দেন। লুসাই ভাষায় একে বলে 'খুয়া যারহ'।

২০. পাড়া বন করা

রাঙামাটির তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসীদের ভেতর অসুখ ও রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে আদি তালিকশাস্ত্র ও নিজস্ব ওঝা-বৈদ্যদের ওপর নির্ভর করা হতো। তবে মহামারি থেকে রেহাই পেতে সামাজিকভাবে 'সুমলাংপূজা' ও 'ফকিরপূজার' আয়োজন করা হতো। প্রাথমিকভাবে যে বাড়িতে রোগের সংক্রমণ দেখা যায়, সেই বাড়িকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশেষ নজরে রাখা হয়। এভাবে ঘর বন্ধ করাকে তঞ্চঙ্গ্যারা বলেন 'গর বন করা'। তারপর মহামারি সংক্রমণ ছড়িয়ে গেলে পাড়ায় মানুষের চলাচল সীমিত করতে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় একে বলে 'পাড়া বন করা'।

২১. বেহেহ রিম

সিলেটের জৈন্তিয়া জাতিসত্তাদের ভেতর মহামারি থেকে সুরক্ষা পাওয়ার নানা ঐতিহাসিক চর্চা এখনো বহাল। বিশেষ করে গ্রামের 'ইয়্যুংআলংয়ে (ধর্মঘর)' সমবেত প্রার্থনা এবং পরিবারভিত্তিক স্বাস্থ্যবিধি পালন। মহামারিকে জৈন্তিয়া ভাষায় বলে 'ইয়াপখ্লাম'। মহামারি থেকে গ্রামের সুরক্ষায় আগের দিনে জৈন্তিয়ারা সামাজিকভাবে 'বেহেহ রিম' আয়োজন করতেন। নিজস্ব 'নংরিম/নংকাহ্নিয়া (পুরোহিত)' এটি পরিচালনা করেন। পূজার পর গ্রাম সুরক্ষিত রাখতে চারধার বন্ধ করে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জৈন্তিয়া ভাষায় একে বলে 'খাংসোনং'। এ সময় অনেকে পিতলের লোটায় কুয়ার পানিতে বংশপরম্পরায় পরিবারে রক্ষিত সোনা-রুপা ডুবিয়ে সেই পানি দিয়ে স্নান করেন এবং ঘরবাড়ি ও রাস্তায় ছিটিয়ে দেন।

২২. রক্ষাকালীপূজা

শেরপুর অঞ্চলের ডালু আদিবাসীরা বিভিন্ন রোগ ও অসুখ থেকে রেহাই পেতে একসময় বিভিন্ন পূজাকৃত্য ও ভেষজ চিকিৎসারীতি পালন করতেন, যেমন বসন্ত রোগ থেকে সুরক্ষা পেতে বাৎসরিক শীতলীপূজার আয়োজন, যার চল এখনো আছে। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচির সময় তাঁরা এটি আয়োজন করেন। চর্মরোগের সংক্রমণ এড়াতে পথখাওরিপূজা করা হয় তিন রাস্তার কেন্দ্রস্থলে। এতে দুটি খড়ের বিড়াল বানানো হয় এবং পূজায় উৎসর্গীকৃত প্রাণীর মাংস রাস্তাতেই খেতে হয়, বাড়িতে আনা যায় না। পূজায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে স্নান করে ঘরে ঢুকতে হয়। আপদ-বিপদ থেকে পরিবারের সুস্থতায় দৈবপূজার আয়োজন করা হতো। যখন কোনো রোগ সংক্রমণ মহামারি পরিস্থিতি তৈরি করত, তখন ডালুরা সামাজিকভাবে রক্ষাকালীপূজার আয়োজন করতেন। এ ছাড়া রোগ সংক্রমণ এড়াতে তারা গাছান্ত কবিরাজি ভেষজ ব্যবহার করেন। কোথাও রোগ ছড়িয়ে গেলে গ্রামের কবিরাজ সবাইকে মন্ত্র পড়ে চিনি খেতে দেন এবং সবাইকে পারিবারিক পরিচ্ছন্নতা পালনের কঠোর নির্দেশ দেন।

এ সময় গ্রামের লপটান (পুরোহিত) প্রতিটি বাড়ির উঠানে যান এবং জল ছিটিয়ে দেন। তারপর গ্রামের সব রাস্তা মান্দারগাছের ডাল পুঁতে বন্ধ করে দেওয়া হয়। মহামারির সময় ডালুরা সচরাচর বাজার ও জনসমাগমে যায় না এবং সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে কঠোর বিধি পালন করে। বাইরে থেকে এসেই হাত-পা ভালো করে ধুয়ে কাপড় পাল্টে ঘরে প্রবেশ করে।

২৩. গাঁও বাইন্ধ লিবে

ওঁরাও আদিবাসীরা বসন্ত রোগের সংক্রমণ না হওয়ার জন্য সামাজিকভাবে ফাগুয়া পরব করে। তবে কোনো রোগের সংক্রমণে মহামারি পরিস্থিতি তৈরি হলে ওঁরাওরা নিজেদের পারিবারিকভাবে বৃহত্তর পাড়া-প্রতিবেশী থেকে নিয়ম মেনে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। সংক্রমণ বাড়লে একজন ওঁরাও 'কোবরেজ (কবিরাজ)' এসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পূজা করে মন্ত্রপূত মাটির সরা স্থাপন করেন। এভাবে বাড়িগুলো চিহ্নিত করে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে গ্রামে চলাচল সীমিত করে গ্রাম বন্ধ করা হয়। এই প্রথাকে ওঁরাওদের চলতি সাদ্রী ভাষায় (কুরুখ ভাষায় এটি এখনো খোঁজা হচ্ছে) বলে 'গাঁও বাইন্ধ লিবে'। মহামারিকালে যারা সুস্থ, তারা হাতে কালো সূতা বেঁধে রাখে। এতে সুস্থ ও সংক্রমিত সহজেই চিহ্নিত হয়। কালো শর্ষে ও বালু একত্রে মিশ্রিত করে বাড়ি বাড়ি ও গ্রামের রাস্তায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

২৪. পুন্টাডি আরিয়ান

নাটোরের পাহাড়িয়া আদিবাসীদের ভেতর সচরাচর কলেরা ও বসন্তের মতো মহামারি সৃষ্টিকারী রোগগুলোর নাম কেউ মুখে আনে না। কলেরাকে 'কলরা' ও বসন্তকে 'আদ্রেই' বলে পাহাড়িয়া ভাষায়। তবে এসব রোগ যখন মহামারি তৈরি করে, তখন কেউ আর এসব নাম বলতে চায় না। মহামারিকে পাহাড়িয়া ভাষায় বলে 'তালহৌরি'। মহামারি থেকে সুরক্ষা পেতে পাহাড়িয়া সমাজে পুন্টাডি আরিয়ানপূজা আয়োজিত হয়। বেলপাতা, তুলসীপাতা, জল, আমন ধানের ঢেঁকিছাঁটা চাল পূজায় ব্যবহৃত হয়। এ সময় বলা হয়, 'তালহৌরি তালহৌরি ডানে বামে আসিস না, সামনে পেছনে ওপরে নিচে আসিস না।' পূজার পর পাড়াতে মানুষের চলাচল সীমিত করা হয় এবং কোনো সামাজিক আয়োজন ও মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হয়।

২৫. লেইকায় পৌরোন থাবা

সিলেট বিভাগের মীতৈ/মৈতৈ মণিপুরি স্বাস্থ্যবিদ্যা অনুযায়ী তিনভাবে কোনো রোগ বা অসুখ সামাল দেওয়া হয়। 'মাইবা/মাইবি/আমাইবা/লাইবুরা (নিজস্ব চিকিৎসক)' কোনো রোগ বা অসুখের সংক্রমণ ঘটলে তিনভাবে এর মোকাবিলার চেষ্টা করতেন।

'পুক-সুবা/খুৎলি পাইবা' বা স্নায়ুচিকিৎসা, ভেষজ চিকিৎসা এবং কৃত্য ও স্বাস্থ্যবিধি পালন। নানা রোগ মোকাবিলায় নানা রকম ভেষজ ওষুধ তৈরি করতেন তাঁরা এবং কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি পালনের নির্দেশনা দিতেন। 'লাইথোকপা (হাম)' হলে 'য়ুমলাই'পূজার আয়োজন হতো। কোনো এলাকায় হামের সংক্রমণ ঘটলে আশপাশের বাড়ির সবাই এক চামচ করে 'য়ু (ঐতিহ্যগত গাজায়িত পানীয়)' খেয়ে নিতেন। নোংবাংখা, লৈহাওমাতন, কোথাপ মাতন ইত্যাদি ভেষজ ব্যবহৃত হতো বসন্ত, কলেরার চিকিৎসায়। এ ছাড়া মাইবা/লাইবুরা 'লাইওয়া-লাইসোন' এবং 'নহাইরোন'কৃত্যও পালন করতেন। 'লাইওয়া-লাইসোন'কৃত্যে অসুখ নিরাময়ের জন্য আদিস্তুতিসহ প্রার্থনা করা হয়। 'নহাইরোন'কৃত্যে পবিত্র 'তাইরেন' ও 'পোংফাই'গাছের পাতা একটি পানিভরা কাঁসার পাত্রে সোনা-রুপাসমেত রেখে আদিস্তুতি পাঠ করা হতো এবং পরবর্তীকালে এই পবিত্র পানি বা 'নহাইরোন' পান করা হতো এবং গ্রামে ছিটানো হতো রোগমুক্তির আশায়। অশুভ শক্তি ও শয়তানকে মীতৈ ভাষায় 'সারোই ঙারোই' বলে। মীতৈ ভাষায় মহামারিকে বলে 'তড়ং-খাওসাবা-লাইনা-লাইচাৎ অথবা লাইচ্যত/লাইচ্যৎ'। 'সনামহি' বা আদি মীতৈ মণিপুরি ধর্মের পবিত্র পুস্তক 'পুয়াতে' মহামারি বা দুর্যোগের বিবরণ আছে এবং উল্লেখ আছে এমন পরিস্থিতিতে ঘরের সীমানার ভেতর বসবাসের; আর যদি নিতান্তই শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে গৃহদেবতা 'লাইনিংথৌ সনামহির' শরণাপন্ন হতে। মহামারি থেকে সামাল দেওয়ার এই 'সঙ্গনিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার' স্বাস্থ্যবিধি কোনো আদি পবিত্র গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া এমনতর স্বাস্থ্যবিধি পালনের ঐতিহাসিকতা তুলে ধরে। অনেকে মনে করেন, 'ফ্যত্ববি/ফত্তবি শোইরেন' বা 'অশুভ খারাপ বাতাস'-এর কারণে নানা নতুন রোগের সংক্রমণ ঘটে এবং এটি একসময় মহামারি পরিস্থিতি তৈরি করে। এমন পরিস্থিতিতে মুরগির ডিমের ওপর কাঁচা হলুদ দিয়ে 'ফত্তবি লাই' বা রোগ-মহামারি সৃষ্টিকারী 'অপদেবতার' প্রতীক বা চিহ্ন আঁকা হয়। তারপর ফুলের মালা পরিয়ে গ্রামের বাইরে গিয়ে একটু জায়গায় 'ফত্তবি লাই'কৃত্য করা হয়। এ ছাড়া অশুভ কোনো বিপদ তাড়ানোর জন্য আয়োজিত হতো 'লাইতানথোকপা' এবং বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির জন্য আয়োজিত হতো 'শারয়খাংবা'কৃত্য। মহামারি ও অশুভ বিপদ থেকে গ্রামরক্ষার আদিশাস্ত্রীয় কৃত্য হলো 'লাইথোং হাংবা, লাইথোং থীংবা'। কোনো বাড়িতে কেউ আক্রান্ত হলে বা কোনো পাড়া সংক্রমিত হলে তাদের বিশেষ নজরে রাখা হয় এবং সেসব বাড়ি ও পাড়ার সঙ্গে চলাচল ও মেলামেশা সীমিত করে দেওয়া হয়। সংক্রমণের বিস্তার ভয়াবহ হলে চলাচল সীমিত করতে পাড়া লকডাউন করে দেওয়া হয়, মীতৈ ভাষায় একে বলা যায়, 'লেইকায় পৌরোন থাবা'। আবার যখন এক গ্রামের সঙ্গে আরেক গ্রামের যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়, তাকে বলে 'খুন চংনদবা/খুনথিংজিনবা'। পরবর্তীকালে কোনো অসুখ বা বিপদ থেকে সুরক্ষা পেতে অনেক

জায়গায় 'নবকীর্তন/নগরকীর্তন' নামে একটি সামাজিক কৃত্যও প্রচলিত হয়। অনেকে প্রতিবছর সামাজিকভাবে এটি আয়োজন করেন। এ সময় গ্রামের অনেকে মিলে মৃদঙ্গ-করতাল বাজিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে 'হরিনাম'কীর্তন ও গান করেন।

২৬. পুরি নারে/পরি নারে

হাম রোগকে মারমা ভাষায় বলে 'ওয়াক্সা'। জলবসন্তকে বলে 'ক্যকফ্রু'। হাম ও জলবসন্তের রোগীর জন্য চর্বি ও তেলজাতীয় খাবার, বেগুন, কচু, চিংড়ি, ইলিশ, রুই খাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে। এ সময় হামের রোগীকে কাঁচা কাঁঠাল, ফলি ও একচোখা মাছ রান্না করে সাদা ভাতের সঙ্গে খেতে দেওয়া হয়। গুটিবসন্তকে মারমা ভাষায় বলে 'ক্যকনি'। এই রোগের বিধি খুবই কঠোরভাবে পালিত হতো এবং এটি মহামারি তৈরি করেছিল। খাবারের তালিকায় তেলমসলা ছাড়া ভাতের সঙ্গে ফাইসা মাছের তরকারি খাওয়া হতো। সচরাচর রোগশোক ও বিপদ থেকে বাঁচতে মারমাদের ভেতর গ্রামের মঙ্গলের জন্য বৈশাখে 'পওচু পজরে'পূজার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া গ্রামের মঙ্গলের জন্য 'রে' এবং 'রোয়া পজরে'পূজার আয়োজন করা হয়। রোগমুক্তির জন্য পরিবারভিত্তিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'কেংথা ফ্রিরে/রাশিপূজার' আয়োজন করা হয়। কোথাও 'সতবি/শনি'পূজার আয়োজন করা হয়। পরিবারের সদস্যদের সার্বিক সুস্থতার জন্য বছরে একবার 'গংছি মাংগালা' বা মাথা ধোয়া পূজা করা হয়। তবে মহামারি পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও গ্রামের সুস্থতার জন্য মারমাদের আদিকৃত্যগুলো সামাজিকভাবেই আয়োজিত হয়ে থাকে।

মারমা ভাষায় মহামারিকে বলা হয় 'রিনাহ রগা/রিনা রোওয়াগা'। আগের দিনে মহামারি দেখা দিলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের গ্রামে রেখে সুস্থ ব্যক্তিরা কিছুদিনের জন্য দূরে চলে যেতেন। মহামারি সামালের আদি মারমা স্বাস্থ্যবিধি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম দিকে বৌদ্ধবিহারে হাজার 'ছোয়াইং (তথাগত বুদ্ধের নামে প্রস্তুতকৃত খাবার)' দিয়ে বুদ্ধের পূজা শুরু হয়। ভিক্ষুরা সারা দিন পরিত্রাণসূত্র, মঙ্গলসূত্র, রতনসূত্রসহ নানা সূত্র পাঠ করেন। দ্বিতীয় পর্বে পাড়ার সবাই 'অষ্টশীল' পালন করেন। তৃতীয় পর্বে নাইছ্রা (পুরোহিত বৈদ্য) বিহারের আঙিনায় 'পুরি নারে/পরি নারে'কৃত্য আয়োজন করেন। বাঁশ দিয়ে মাচাং বানানো হয় এবং এর ওপর দেবতাদের জন্য ছোট ছোট কক্ষ বানানো হয়। তারপর ফুল, দশ পদের ফল, খই দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। এ সময় ৪ থেকে ৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু শিষ্যদের সামনে দেশনা প্রদান করেন। দেশনাতে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সব মানুষসহ জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে বিচরণকারী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব প্রাণীর রোগমুক্তি কামনা করা হয়। এ সময় বাড়ি বাড়ি এবং পাড়া ও গ্রামে মন্ত্র পড়া পানি ও চাল ছিটানো হয়। কাঁচা বাঁশ এবং কার্পাস তুলার সাদা চিকন সুতা বিশেষভাবে ৯ প্যাঁচ দিয়ে বাড়ি বাড়ি ও গ্রামের সব রাস্তায় ঘেরাও দেওয়া হয়। এতে

বোঝা যায় মহামারির সংক্রমণ ঘটেছে এবং পাড়া ও গ্রাম বন্ধ হয়েছে। মারমা ভাষায় একে বলে 'রোয়া খাং/রোওয়া খাং'। পাড়ার কারবারিসহ গ্রামের পরিবারভিত্তিক সবাই মিলে কঠোর স্বাস্থ্যবিধি পালনের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাধারণত শনি-মঙ্গলবার এই পাড়া বন্ধ করা হয়। পাড়ার সবার ঘরবাড়ি ও উঠান পরিষ্কার করে পাড়ার মাঝখানে একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি হয় এবং ভান্তে সেখানে 'মঙ্গলসূত্র' পাঠ করেন ও প্রত্যেকে ঘরে ঘরে 'রতনসূত্র' পাঠ করেন।

২৭. টলাপূজা

রাজশাহীর আদিবাসী কডা সমাজে বসন্ত ও কলেরার জন্য বাৎসরিক শীতলাপূজার আয়োজন হলেও মহামারি পরিস্থিতিতে তারা সামাজিকভাবে গ্রামে সন্ধ্যায় 'টলাপূজা' করে। পূজার পর গ্রামের মাঝবরাবর একটি লম্বা বাঁশে লাল নিশান টাঙিয়ে দেওয়া হয় এবং গ্রামে প্রবেশ বা গ্রাম থেকে বাইরে যাওয়াকে সীমিত করার জন্য 'টলা বন্ধ' বা গ্রাম বন্ধ করা হয়। আগের দিনে কডারা যখন বুনো লতাপাতার তৈরি 'কুম্বা' নামের বিশেষ ঘরে থাকত, তখন মহামারির সময় তারা কুম্বা থেকে প্রয়োজন ছাড়া বের হতো না এবং তাদের বিশ্বাস, কুম্বাই তাদের সব জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখতে পারে।

২৮. ভাসান কালীপূজা

ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের হাজং আদিবাসীরা পারিবারিক ও পাড়াগতভাবে পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তুলেছে। নিয়মিত রোগ-বিপদ থেকে মুক্তির জন্য কামাখ্যা, শনিঠাকুরপূজা, একাদশীর ব্রত পালন করে থাকে। তবে মহামারি পরিস্থিতিতে সামগ্রিক অঞ্চলের সুরক্ষায় গ্রামপর্যায়ে সামাজিকভাবে ভাসান কালীপূজার প্রচলন ছিল। মহামারিকালে অনেকে পারিবারিকভাবে মইলাদেও, খাংখাংনি দেও, গাং দেওপূজারও মানত করে। এ সময় হাজংরা ঘরবাড়ি ও গ্রাম খুবই পরিচ্ছন্ন রাখে। প্রতিটি বাড়ি ও গ্রামের ময়লা ফেলার স্থান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঘুম থেকে ওঠার পর নারীরা স্নান সেরে রান্নার কাজ করেন। খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে নিরামিষ এবং হাজংদের ঐতিহ্যবাহী লেবাহাক, ক্ষার পানি খাওয়া হয়। সংক্রমিত এলাকায় চলাচল সীমিত করা হয়।

২৯. মাতোপূজা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীর কোল আদিবাসীরা মহামারি থেকে গ্রামের সুরক্ষায় সামাজিকভাবে 'মাতোপূজা' আয়োজন করে। কোথাও রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে গেলে গ্রামের পরিবারের প্রতিনিধিরা মণ্ডল বা গ্রামপ্রধানের বাড়িতে সমবেত হন। তারপর একটি দিন ঠিক করে দিনব্যাপী উল্লিখিত পূজার আয়োজন হয়। এ সময় গ্রামে

বহিরাগতদের প্রবেশ সীমিত করা হয়। পূজায় পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়। এরপর সবাই গ্রামের 'গ্রামকালী' পবিত্র স্থলে আসেন এবং কলস দিয়ে সেখানে পানি ঢেলে দেন। একজন ওঝা বা কবিরাজের মাধ্যমে 'মাতো টল' বা গ্রাম বন্ধ করা হয়। ওঝা গ্রামে প্রবেশের সব পথ বন্ধ করার জন্য গ্রামকে একটি ত্রিভুজাকৃতির কল্পিত রূপ দেন এবং তিন কোনা থেকে মেপে মেপে ত্রিভুজের মধ্যস্থলটি নির্ধারণ করেন। তারপর সেখানে লম্বা একটি বাঁশ টাঙানো হয় এবং বাঁশের মাথায় একটি মাটির ঢাকনা বা সরা উপুড় করে রাখা হয়। এই চিহ্ন দেখা গেলে কেউ আর সে গ্রামে ঢুকতে পারে না এবং গ্রামের মানুষও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হন না।

৩০. গরে ত না নিকুলানি

সিলেট বিভাগের বিষ্ণুপ্রিয়া/বিষ্ণুপুরিয়া মণিপুরি ভাষায় মহামারি পরিস্থিতিকে বলে 'মুর্কি'। কলেরা, বসন্তের মতো মুর্কি পরিস্থিতি তাঁরা সামাল দিয়েছেন এবং মহামারি সামাল দিতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিরা পাড়াভিত্তিক 'নগরকীর্তন' আয়োজন করেন। মৃদঙ্গ, ঢোল, মন্দিরা, ঝাঁঝর বাজিয়ে নারী-পুরুষের একটি দল পাড়া ঘুরে ঘুরে কীর্তন করে মানুষকে মহামারি পরিস্থিতিতে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান। এ ছাড়া গ্রামে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে 'চৈতন্যপূজা' আয়োজিত হয়। এখানে চৈতন্য-ভাগবত থেকে পাঠ করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের ক্ষীর-মোয়া দেওয়া হয়। ধারেকাছে রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে গ্রামের সবাই মিলে পাড়া বন্ধ করে দেন। পাড়া বন্ধ করাকে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় বলে 'গরে ত না নিকুলানি'। মানে ঘর থেকে কেউ বের হতে পারবে না, গ্রামে বাইরে থেকে ঢুকতে পারবে না।

৩১. শংহে

বান্দরবানের চাক আদিবাসীদের ভাষায় মহামারিকে বলা হয় 'আমোহ্রাকা-ড়োকা'। মহামারি সামাল দেওয়ার জন্য চাকরা নানা ভেষজ ব্যবহার করে এবং খাবারদাবারের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি মেনে চলে। আশপাশে কোনো এলাকায় রোগের সংক্রমণ ঘটলে চাকরা পাড়াভিত্তিক নানা সামাজিক বিধি পালনের জন্য সবাই মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মহামারি যাতে গ্রাম ও পাড়ায় সংক্রমিত না হতে পারে, এ জন্য তারা সামাজিকভাবে 'পাড়াভিত্তিক পূজা' এবং 'গৃহভিত্তিক পূজা'র আয়োজন করে। পাড়া পূজা দুই ধরনের 'থিং কানাইহে' ও 'গমুং'। মূলত মহামারির সময় 'গমুং' আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া গৃহভিত্তিক পূজাকে বলা হয় 'কিং-রাছুহে'। পরিবারের সবার সুস্থতা কামনায় এটি আয়োজিত হয়। সামাজিক কৃত্য আয়োজনের ভেতর দিয়ে চাকরা গ্রাম ও পাড়ায় মানুষের চলাচল সীমিত করে এবং ধীরে ধীরে পুরো এলাকা লকডাউন করে দেয়। চাক ভাষায় এই প্রথাগত লকডাউনকে বলে 'শংহে'।

ছক : মহামারি সামাল দেওয়ার আদিবাসী স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি (সংগ্রহ ও সমন্বয় : পাভেল পার্থ, ৩০ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত হালনাগাদ)

নং	আদিবাসী জাতি	মহামারি	পাড়া/গ্রাম লকডাউন	বিশেষ কৃত্য/রীতি
১.	মান্দি/গারো	সিগ্রেমা	রামা দেংচেংআ (রাস্তা বন্ধ) সঙ দেংচেংআ (গ্রাম বন্ধ)	দেনমারাংআ
২.	কোচ	মালাংনি	চিংয়ে হারিকু খাই চিয়ে আ	নকনিওয়াই, কামাখ্যা, শীতলা, গেরামপূজা
৩.	রাখাইন	রিনাহ্ রগা	প্রারাই এরা	চোয়াইসেন মা এম্প্যা
৪.	খুমি	কাংহয়	আভাং আখো	আপাই চিমিউ
৫.	ম্রো	হয়	খাং কোয়া	ডুব আং
৬.	লেঙ্গাম	জিয়াপখ্লাম	কাং চোনং বাই ঙিয়াপখ্লাম	
৭.	পাংখোয়া	রি-পুই	খোয়া খার	লুংতেরঙেট ইন তোয়ালে রিত
৮.	চাকমা	ডঙ্গা পিড়ে	আদাম বন গরানা	থাংমানা/থাম্মানা পূজো
৯.	ত্রিপুরা	হাইঞা হামিয়া	কামি নি লামা মুথুকজাক	কেরপূজা/বারিনি মাতাইপূজা
১০	সাঁওতাল	মারাংনাস	কারহাড় পাটেত, আতো কুলুপ	বাহা পরব এবং মৌঞ্জিহিথানে দা : দুল
১১.	খাসি	ইয়ামখ্লাম	খাং খারদেপ ছোনং বাহ ইয়াপখ্লাম	কাইনিয়া ছোনং/রিম ছোনং
১২.	কড়া	দুর্দশা	বাঁধ দেওয়া	শিবথানপূজা
১৩.	মুন্ডা	...	...	সারুল
১৪.	রবিদাস	আকাল গিরালবা	উঘর না যায় পড়ি	অঘনী, শাওনী, বাইশাখী এবং শীতলা
১৫.	লালেং/পাত্র	...	গাওরাখলা আবইল্যা বনসোয়ে	সিতলিসেবা
১৬.	বম	পুলপি	প্লেংখাম	...
১৭.	বেদিয়া মাহাতো	মহামারি	...	গাওগাঞ্জারী
১৮.	খিয়াং	লোগা/লগা	হেনেই	চোবই
১৯.	লুসাই	হ্ন পুই	খুয়া যারহ	রাম নুয়াই আহ আন ভ্লান

নং	আদিবাসী জাতি	মহামারি	পাড়া/গ্রাম লকডাউন	বিশেষ কৃত্য/রীতি
২০.	তঞ্চঙ্গ্যা	...	গর বন করা, পাড়া বন করা	সুমলাংপূজা, ফকিরপূজা
২১.	জৈন্তিয়া	ইয়াপখ্লাম	খাং সোনং	বেহেহ রিম
২২.	ডালু	...	...	রক্ষাকালী
২৩.	ওঁরাও	...	গাও বাইন্ধ লিবে	ফাগুয়া পরব
২৪.	পাহাড়িয়া	তালহৌরি	...	পুন্টাডি আরিয়ান
২৫.	মীতৈ মণিপুরি	লাইচ্যত/লাইচ্যৎ	লেইকান পৌরোন থাবা, খুন চংনদবা	ফত্তবি লাই, লাইওয়া-লাইসোন, নহাইরোন
২৬.	মারমা	রিনাহ রগা/রিনা রোওয়াগা	রোয়া খাং/রোওয়া খাং	পুরি নারে/পরি নারে
২৭.	কডা	...	টলা বন্ধ	টলাপূজা
২৮.	হাজং	...	...	ভাসান কালীপূজা
২৯.	কোল	...	মাতো টল	মাতোপূজা
৩০.	বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি	মুর্কি	গরে ত না নিকুলানি	নগরকীর্তন
৩১.	চাক	আমোহ্রাকা-ড়োকা	শংহে	গমুং

ওপরে বর্ণিত ৩১ আদিবাসী জাতিসত্তা ছাড়াও আরও কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের মহামারিবিষয়ক কিছু প্রথা ও বিধি জানা গেছে। তবে সেসব বিবরণ বিস্তারিত নয়। যেমন নাটোরের গঞ্জু আদিবাসীরা মহামারি থেকে বাঁচার জন্য সামাজিকভাবে 'ডালপূজার' আয়োজন করেন। আবার চা-বাগানে দোসাদ, ভূমিজ, উড়িয়া, কুর্মী মাহাতো, গৌড় আদিবাসীরা অসুখ, রোগ-জরা ও সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা পেতে বছরব্যাপী টুসু পরব, মনসাপূজা, দণ্ডবর্ত আয়োজন করেন। সুনামগঞ্জের বানাই আদিবাসীরা বসন্ত ও কলেরার জন্য শীতলীপূজা করেন এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলেন। চট্টগ্রামের পটিয়া চা-বাগান এলাকার ঢেরপাড়ার ঢের আদিবাসীরা মহামারি ও রোগ সংক্রমণ থেকে বাঁচতে গ্রাম পূজা করেন এবং সাময়িক বিচ্ছিন্নতা মেনে চলেন। উত্তরবঙ্গের মুসহর আদিবাসীরা বিপদ ও মহামারি থেকে বাঁচার জন্য গ্রামের মঙ্গল কামনায় আগের দিনে সামাজিকভাবে বনে গিয়ে 'বেলছিরি'কৃত্য করতেন এবং স্নান সেরে কয়লার আগুনে হাম-পা গরম করে ঘরে প্রবেশ করতেন। এরপর তারা বেশ কিছুদিন সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলতেন। এ রকম অনেক জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকেই মহামারি সামালের বিস্তারিত বিবরণ জানার প্রক্রিয়া চলমান আছে।

জরা-ব্যাধি ও মহামারি বিনাশের লোকায়ত শক্তি

ষড়্ঋতুর বাংলাদেশ এখন কত ঋতুর দেশ, তা আরেক লম্বা তর্কের তল। প্রতিটি

ঋতুর সন্ধিক্ষণ হলো সংক্রান্তি। আর এই সময় জরা-ব্যাধি জয় করে নতুন আরেক বছরের জন্য সঞ্জীবনী সঞ্চয়ের সময়। গ্রামীণ নিম্নবর্গ অসুখ ও মহামারিকে সামাল দিতেই সংক্রান্তির সময়গুলোতে নিজেদের নানা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। খাদ্য থেকে শুরু করে চারপাশের পরিচ্ছন্নতা, সাময়িক বিচ্ছিন্নতা থেকে নানামুখী সঙ্গনিরোধ—এসব মিলিয়েই আমাদের সংক্রান্তি আয়োজন। সংক্রান্তি কেবল গাজনের গীত বা তিতা শাকের পরব নয়। মহামারি থেকে বাঁচার এক সামষ্টিক স্থানীয় কায়দা। প্রকৃতিকে জানা-বোঝার জন্য এক সামাজিক আহ্বান। সংক্রান্তিতেই সমাজ প্রকৃতির বিশেষ কিছু বিশেষভাবে গ্রহণ করে ও সামাজিক বিধিনিষেধগুলোর পাবলিক চর্চা করে। মূলত এর ভেতর দিয়ে সমাজ জানাতে চায়, প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু করণীয় ও বিধি আছে। এসব বিধি আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতেই সংক্রান্তির নানা কৃত্য আয়োজন। কিন্তু আমাদের বর্তমান তথাকথিত আধুনিক ও 'সভ্য' শহুরে সমাজে প্রতিদিন প্রকৃতির এই ব্যাকরণকে অমান্য ও তছনছ করা হয়। ঋতুর সন্ধিক্ষণ পাঠের কোনো চর্চা ও শিখনস্থল এখন আমাদের কাঠামোগত বিদ্যায়তনে নেই। আমাদের নাগরিক জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ কোনো বিধিনিষেধ নেই। এখন সারা বছর বাজারমুখী শস্য মেলে। কোনো কিছু দেখে বোঝার উপায় নেই এটা কোন ঋতু। আমরা তাহলে এমন করপোরেট ভোগবাদী উন্নয়ন দিয়ে কার লাভ আর কার ক্ষতি করছি? প্রকৃতির ধারাপাত চুরমার করে দিচ্ছি বলেই ইবোলা, ডেঙ্গু বা আজ কোভিড-১৯ মহামারিতে দুনিয়া বিপর্যস্ত।

আমাদের আদিবাসী সমাজে প্রকৃতির বিজ্ঞানকে মান্য করার এক অবিস্মরণীয় শক্তি ও দর্শন আছে। অসুখ ও মহামারি মোকাবিলার নিম্নবর্গীয় আদি কায়দাগুলোর শিক্ষা ও স্মৃতি থেকে বিমুখ ও বিস্তৃত হলেও এখনো আমরা সেগুলোই পালন করতে মরিয়া হয়েছি। অসুখ ও মহামারি সামাল দিতে আদিবাসী সমাজ নানা কৃত্য ও বিধিপালনের মাধ্যমে ব্যক্তি নয়, সামষ্টিক সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে 'সাময়িক বিচ্ছিন্নতা' ও 'সঙ্গনিরোধের' মতো কঠোর নিয়মগুলো ঐতিহাসিকভাবেই পালন করে আসছেন। পরবর্তীকালে রোগের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দিয়েছেন। আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মহামারি সামালে লকডাউন, কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন ও লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসার মতো যে বৈশ্বিক স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করছে, তা কিন্তু আদিবাসী সমাজগুলোতে অনেক আগে থেকেই বহুলভাবে চর্চিত। চলতি আলাপে দেশের ৩১টি আদিবাসী জাতির মহামারি সামালের বর্ণিত খুদে বিবরণগুলোই এর প্রমাণ। তার মানে, কোভিড-১৯ মহামারি সামালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদেয় স্বাস্থ্যবিধিগুলো মূলত আদিবাসী সমাজেরই উদ্ভাবন, কারণ, আদিবাসী সমাজে এখনো এসবের চর্চা এবং বহমান জ্ঞানভাষ্যর চেয়ে প্রাচীন দলিল কি নথি, কোনো কাঠামো বা বিদ্যায়তনের কাছেই নেই। কিন্তু অধিপতি ব্যবস্থায় আদিবাসী জাতিদের 'অপর' ও 'প্রান্তিক' করে রাখায়

আদিবাসী সমাজের এই সব অবিস্মরণীয় জ্ঞানভাষ্য বরাবরের মতোই নিদারুণভাবে প্রান্তিক হয়ে আছে। অথচ চলমান মহামারি সামাল দেওয়ার কত বিধি কি সূত্র এখানেই হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব। করোনাকালেও মহামারির এক ঔপনিবেশিক চেহারাই প্রবল হয়ে উঠছে—কি জ্ঞানভাষ্যে কি পরিসরে। নিম্নবর্গের মহামারি সামালের স্মৃতি ও বিদ্যা কোথাও তলিয়ে দেখা হচ্ছে না। যেন মহামারি সামালের ক্ষেত্রে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক গরিমা আর বিদ্যায়তনিক বাহাদুরিই একমাত্র শেষকথা। চলতি আলাপটি দেশের ৩১টি আদিবাসী জাতির মহামারি সামালের কৃত্য ও বিধির সংক্ষেপ বিবরণকে একত্র করে চলমান 'করোনা মহামারির' প্রবল জ্ঞানকাণ্ডের ঔপনিবেশিকতাকে প্রশ্ন করছে। নিম্নবর্গের এই বি-ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাষ্যকে মহামারি মোকাবিলার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় স্বীকৃতিসহ যুক্ত করার প্রস্তাব রাখছে।

চলমান করোনা মহামারিকালেও আমরা বিশ্বব্যাপী 'কোয়ারেন্টিন' আর 'লকডাউনের' পদ্ধতিই গ্রহণ করেছি, তাকিয়ে আছি প্রতিষেধকের দিকে। আদিবাসী সমাজের লোকায়ত জ্ঞানভাষ্য এই জানায়, যেকোনো সংকট ও মহামারিকাল কেটে আবার এক স্বপ্নময় জীবন শুরু হবে। তবে তার জন্য দরকার শরীর ও মনের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতির জন্য প্রাণ ও প্রকৃতির কাছে নতজানু হওয়া জরুরি। প্রতিবেশের ক্রান্তিকাল ও বিধিগুলো মান্য করা জরুরি। ব্যক্তি নয়, সামষ্টিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই সংকট ও মহামারি মোকাবিলা করতে হয়। সামাজিকভাবে নিয়ম ও বিধি মানার সামর্থ্য ও সংস্কৃতি তৈরি করতে হয়। প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উৎপাদনব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার সৃজনশীল বিকাশই নাশ করতে পারে মহামারিকাল।

রচনাকাল : আদি লেখাটির রচনাকাল ১৫ মার্চ ২০২০ এবং সেটির সূত্র ধরে চলতি এই নতুন পরিসরের লেখাটি তৈরি হয়েছে ৩০ জুলাই ২০২০-এ।

ঋণস্বীকার

আমার চলমান গবেষণা প্রস্তাবটি উত্থাপিত হওয়ার পর সবাই নিজ জাতির মহামারিবিষয়ক বিপন্ন বিজ্ঞানের স্মৃতিকণার টুকরা খুঁজে বের করার এক অসামান্য পরিশ্রম করেছেন। করোনা মহামারিতে এর কিছুটা চর্চা ছাড়া আর সবই নিজেদের যাপিত জীবনে প্রায় 'হারিয়ে' গিয়েছিল। করোনা মহামারিকালে সবার এই অবিস্মরণীয় শ্রম কোনো নিতান্ত 'ধন্যবাদের' ভেতর সীমাবদ্ধ থাকার নয়। এটি তো আমাদের আত্মপরিচয়ের এক বি-ঔপনিবেশিক লড়াইয়েরই অংশ। সচরাচর আমার ঋণস্বীকার অংশটি দীর্ঘ হয়। কারণ, 'মেধাস্বত্ব অধিকারের মৌলিক নীতি' মেনে আমার কাজগুলো তৈরি হয়। চলতি আলাপেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি, তবে করোনাকালের বিশেষ যোগাযোগধর্মী গবেষণা পদ্ধতির কারণে এখানে সবার নাম ও হদিস হয়তো বাদ পড়ে যেতে পারে। এ কারণে আমি আবারও সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

- বম : জুয়ামলিয়ান আমলাই, পরিবেশকর্মী ও আদিবাসী নেতা, বান্দরবান। জেমসন আমলাই, সংস্কৃতিকর্মী, বান্দরবান। স্যাং বম ও বোসথাং বম, সদর, বান্দরবান।
- পাংখোয়া : লালটান কলিন্স পাংখোয়া, শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক, বিলাইছড়ি, রাঙামাটি।
- খুমি : লিলেং খুমি, গবেষক ও সংগঠক, বান্দরবান। তাইঅং খুমি, জুমিয়া, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান, প্রেআং খুমি, রুমা, বান্দরবান।
- খিয়াং : ক্যইমা খিয়াং, জুমিয়া, গোংগুরুমুখপাড়া, বান্দরবান। জনি খিয়াং, উন্নয়নকর্মী, বান্দরবান।
- জৈন্তিয়া : সেনথার স্বার্তী, বিশারদ, নিজপাট, সিলেট। লাবনী স্বার্তী, গবেষক, নিজপাট, জৈন্তাপুর, সিলেট।
- বেদিয়া মাহাতো : পদমনি মাহাতো ও করশনাথ মাহাতো, কৃষক, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট। বিভূতীভূষণ মাহাতো, এমফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। দীপক মাহাতো, আদিবাসী ছাত্রনেতা, পাবনা।
- ওঁরাও : বিচিত্রা তির্কী, আদিবাসী নেতা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। শিবেন ওঁরাও, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। স্বপন এক্কা, উন্নয়নকর্মী, বর্তমানে কক্সবাজারে কর্মরত। অলি বন্যা কুজুর, উন্নয়নকর্মী, ঢাকা। মিটুন টপ্প, আদিবাসী গবেষক, ঢাকা।
- গঞ্জু সিং : সুনীল কুমার সিং, কৃষক, লালপুর, নাটোর। হরেন সিং, সংস্কৃতিকর্মী, মাদল।
- তঞ্চঙ্গ্যা : রঞ্জিত তঞ্চঙ্গ্যা, উদ্যোক্তা, কাপ্তাই, রাঙামাটি।
- ম্রো : রতরুই ম্রো, শিক্ষার্থী, রামরিপাড়া, বান্দরবান। খামলাই ম্রো, তিনতেপাড়া, বান্দরবান। ইয়াং রুং ম্রো, শিক্ষক, এমপুপাড়া, বান্দরবান। তংসং ম্রো, বান্দরবান। ম্যানয়ং ম্রো, এমপুপাড়া, বান্দরবান।
- চাক : মংমং চিং চাক, শিক্ষক, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান। মা শৈ থুই চাক, উন্নয়নকর্মী, বান্দরবান। রিগান কানু, অধিকারকর্মী, চা বাগান, হবিগঞ্জ।
- কোচ : মিঠুন কোচ, কবি, ঝিনাইগাতী, শেরপুর। রাধারানী কোচ, রাংটিয়া, শেরপুর। যুগল কোচ, গবেষক, ঝিনাইগাতী, শেরপুর। ঊষা রঞ্জন কোচ, আদিবাসী নেতা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর। সুজন বর্মণ, ব্যবসায়ী, পীরগাছা, মধুপুর, টাঙ্গাইল।
- কোল : লক্ষ্মণ কোল, কৃষিমজুর, ঝিলিম ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। কার্তিক কোল, গ্রামপ্রধান, বাবুডাইং, রাজশাহী। হরেন কোল, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বাবুডাইং, রাজশাহী।
- কডা : সবুজ মাকোয়ার, শিক্ষার্থী, রাজশাহী। সোহাগ সাপু, পটিয়া, রাজশাহী। অজয় চাওড়া, বেলনা-ঝালপুকুর, রাজশাহী, বনমালী মাকোয়ার, দিনমজুর, হায়দারহাট, রাজশাহী। অজয় লাকড়া, কুন্দাইন, রাজশাহী।
- সাঁওতাল : সাধু মতিরাম সরেন, সারিসারনা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, তানোর, রাজশাহী। রেখা হাঁসদা, কৃষক, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর। মানিক সরেন, লেখক ও গবেষক, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। মুংলি টুডু, দিনমজুর, বাগদাফার্ম, গাইবান্ধা।
- লালেং : লক্ষ্মণ পাত্র, মন্তানী (গুণীজন), দলইপাড়া, সিলেট। গৌরাঙ্গ পাত্র, পাত্র সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষদ, সিলেট।
- হাজং : মতিলাল হাজং, লেখক ও গবেষক, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা। ইলিমেন্ট হাজং, উন্নয়নকর্মী, সুনামগঞ্জ।
- খাসি : বাবলা নায়াং, খাসি নিয়ামত্রে ধর্মপালনকারী, এওলাছড়া, মৌলভীবাজার। জনি লাংবাং, শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এন্ড্রু সলোমার, আদিবাসী নেতা, রাজাই, সুনামগঞ্জ।

সিলভানুস লামিন, নিরালাপুঞ্জি, মৌলভীবাজার।

- লুসাই : লিনা জেসমিন লুসাই, অধিকারকর্মী ও গবেষক, বান্দরবান। লালথাংআ লুসাই, হেডম্যান, সাজেক, রাঙামাটি।
- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি : শুভাশিস সিনহা, কবি ও নাট্যজন, ঘোড়ামাড়া, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
- মান্দি/গারো : জনিক নকরেক, দার্শনিক, চুনিয়া, মধুপুর, টাঙ্গাইল। দিনেশ রেমা, কামাল, মধুপুর, টাঙ্গাইল। টুকিয়া রেমা, কামাল, উৎরাইল, নেত্রকোনা।
- চাকমা : প্রমেশ্বর চাকমা, কবি ও শিক্ষাকর্মী, সদর, খাগড়াছড়ি। অন্বেষা চাকমা পরানী, অধিকারকর্মী, রাঙামাটি। রিপন চাকমা, সংগঠক, খাগড়াছড়ি। সুকিরন চাকমা, উন্নয়নকর্মী, খাগড়াছড়ি।
- ডালু : গুণ সরকার, কবিরাজ, নালিতাবাড়ী, শেরপুর। রমা ডালুনি, নালিতাবাড়ী, শেরপুর। ননীগোপল ডালু, চাকরিজীবী, ময়মনসিংহ।
- ত্রিপুরা : পপেন ত্রিপুরা, গবেষক ও সংবাদকর্মী, খাগড়াছড়ি। শ্যামল দেববর্মা, গবেষক, ডলুবাড়ি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- রবিদাস : জগদীশ রবিদাস, ঝিটকা ধামের চৌধুরী, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ। উপেন রবিদাস, অধিকারকর্মী, রাজশাহী। শিপন রবিদাস প্রাণকৃষ্ণ, সংগঠক, বগুড়া।
- ঢের : কেশব রায়, ঢেরপাড়া, পটিয়া চা-বাগান, চট্টগ্রাম।
- রাখাইন : মংতাহান, গবেষক, তালতলী, বরগুনা। অং থাং, সিয়েন, বৈদ্য, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। মেইনথেন প্রমীলা, অধিকারকর্মী ও লেখক, ঢাকা।
- মারমা : মংহ্লা মারমা, বৈদ্য, কমলছড়ি, খাগড়াছড়ি। রেপ্রু বৈদ্য, রামগড়, খাগড়াছড়ি। পাইউমং চৌধুরী (বাবু), গবেষক, রামগড়, খাগড়াছড়ি। মংখ্যাই মারমা, পরিতোষ মারমা, ঞয়লা মং ও পুলুমা মারমা, খাগড়াছড়ি। হ্লা সিং নু, নির্বাহী পরিচালক, বিএনকেএস, বান্দরবান। মংমংসিং, প্রধান নির্বাহী, হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন, বান্দরবান। উ চিং মং, অধিকারকর্মী, বান্দরবান।
- গৌড় : সঞ্জীব প্রসাদ গড়, কুরমা চা-বাগান, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
- মুসহর : রুহিত ঋষি, দিনমজুর, ঠুমনিয়া, ঠাকুরগাঁও।
- মুন্ডা : কৌশল্যা মুন্ডা, কৃষিমজুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। কৃষ্ণপদ মুন্ডা, সংগঠক, সাতক্ষীরা। লক্ষ্মণ মুন্ডা, চা-শ্রমিকনেতা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। সবিন চন্দ্র মুন্ডা, আদিবাসী সংগঠক, নওগাঁ।
- পাহাড়িয়া : কাজল পাহাড়িয়া, কৃষিমজুর, গোকুলনগর, নাটোর। ভুবন পাহাড়িয়া, দিনমজুর, নাটোর।
- বানাই : লুধর সিং বানাই, দিনমজুর, মোহনপুর, সুনামগঞ্জ। রহিলা দেবী, দিনমজুর, মোহনপুর, সুনামগঞ্জ।
- মীতৈ মণিপুরি : লেইরেন সিংহ, মায়বা, ফটিগুলি, কর্মধা, মৌলভীবাজার। সত্যজিৎ সিংহ, শিক্ষক ও পরিবেশকর্মী, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

এ ছাড়া চলতি গবেষণার কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে এগিয়ে এসেছেন একদল সৃজনশীল মীতৈ গবেষক ও লেখক। বিশিষ্ট লেখক কন্থৌজম সুরঞ্জিত 'Meitei (ethnographical) narrative/ritual on pandemic' নামের একটি মেসেঞ্জার গ্রুপ চালু করে দিলেন ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখ রাতে। আর সেখানে যোগ দিলেন কেশর সিংহ, মাইবম সাধন, রবি সিংহ

রাজেশ, হাওবাম সুধীর, অইনাম লানথইসহ অনেক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক। অইনাম লানথই বিস্তর ঘেঁটে এক খুদে 'অভিসন্দর্ভই' তুলে ধরলেন।

তথ্যসূত্র

১. লেখাটি পড়ার জন্য ক্লিক করা যেতে পারে : https ://www.deshrupantor.com/editorial-news/2020/02/05/197132; https ://www.bhorerkagoj.com/2020/02/06/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A4/; https ://bonikbarta.net/home/news_description/220072/%E0%A6% 89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F-%E0%A6%93%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8% E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0% A6%BE%E0%A6%B8- (৩০ জুলাই ২০২০ তারিখে প্রতিটি লিংকে প্রবেশ করা হয়েছে)।

২. এ-সম্পর্কিত নানা লেখা দেখা যেতে পারে। এখানে কিছু লেখার নমুনা দেওয়া হলো। একেকটি লেখা আলাদা বোঝার জন্য দুটি ভিন্ন লেখার মাঝখানে '/' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। Pandemics and the global environment I Kip Hodges and Jeremy Jackson I *Science Advances* I 12 Jun 2020/Environmental democracy in times of COVID-19 I Executive Secretary I UNECE I 5 June 202/Grasp the silver lining of the COVID-19 pandemic I Kamal Gueye I ILO I 5 June 2020/UNEP COVID-19 Factsheet—Global Environmental Governance I UNEP I May 2020/WHO Manifesto for a healthy recovery from COVID-19. WHO I 26 May 2020/GEF's response to COVID-19 I 21 May 2020/IUCN Acting Director General's statement for International Day for Biological Diversity. IUCN I 19 May 2020/Working with the environment to protect people : UNEP's Covid-19 response. UNEP I 14 May 2020/The coronavirus is not good for nature. Marco Lambertini I Al Jazeera I 14 May 2020/The COVID-19 crisis shouldn't undermine the need for environmental action. Quite the opposite. Anna Brach I GCSP I 8 May 2020/UNEP Response to COVID-19. UNEP I 7 May 2020/A crucial opportunity for change following the COVID-19 pandemic. Marco Lambertini I WWF I 6 May 2020/The Executive Director's Statement to the 150th Meeting of the Committee of Permanent Representatives. Inger Anderson. UNEP I 30 April 2020/Opinion : Faith, COVID-19 and the push for a healthy environment. Inger Anderson (UNEP) and Azza Karam (Religions for peace) I DW I 29 April 2020/COVID-19 pandemic, an 'unprecedented wake-up call' for all inhabitants of Mother Earth. UN News I 22 April 2020/Environmental impacts of coronavirus crisis, challenges ahead. Robert Hamwey I UNCTAD I 20 April 2020/Statement from the Partnership for Action on Green Economy : The Choices We Make Now Will Shape the Future. PAGE I 14 April 2020/GEF CEO : 'We need to protect our

one common home'. GEF I 9 April 2020/IUCN statement on the COVID-19 pandemic I 8 April 2020/The biodiversity leader who is fighting for nature amid a pandemic I Smitri Mallapaty I nature I 30 June 2020/The COVID-19 pandemic is not a break for nature—let's make sure there is one after the crisis. Sebastian Trong, Edward Barbier and Carlos Manuel Rodrguez IWorld Economic Forum I 21 may 2020/Biodiversity, pandemics and the circle of life. Joel Makower I GreenBiz I 20 April 2020./Nature is sending us a message : Biodiversity loss and wildlife trade as causes of pandemics—German Ministry for the Environment (BMU) I John Scanlon I 29 June 2020/How deforestation helps deadly viruses jump from animals to humans I Amy Y. Vittor, Gabriel Zorello Laporta, Maria Anice Mureb Sallum I The Conversation I 25 June 2020/COVID 19 : urgent call to protect people and nature I WWF I June 2020/Coronavirus is a warning to us to mend our broken relationship with nature I Marco Lambertini, Elizabeth Mrema and Maria Neira I The Guardian I 17 June 2020/Protect landscapes to protect humanity I UNEP I 16 June 2020/A Crucial Step Toward Preventing Wildlife-Related Pandemics I Dan Ashe & John E. Scanlon I Scientific American I 15 June 2020/Coronavirus shows we must change our economy to recognise that human wealth depends on nature's health I Professor Sir Partha Dasgupta, Inger Andersen I Independent I 5 June 2020/Protect the environment, prevent pandemics, 'nature is sending us a clear message' I UN News I 4 June 2020/ Make transformative changes to protect environment or endure incalculable suffering - UN rights expert I SR Environment I 4 June 2020/UNEP COVID-19 Facsheet—Zoonotic Diseases I UNEP I May 2020/Position statement : managing wildlife trade in the context of COVID-19 and future zoonotic pandemics I Oxford Martin Programme on the Illegal Wildlife Trade and the Interdisciplinary Centre for Conservation Science I University of Oxford I 15 April 2020/'We need to work together and follow the science' I Gustavo Fonseca I GEF I 14 April 2020/COVID-19 and nature are linked. So should be the recovery I Marie Quinney I WEF I 14 April 2020/A message from the Secretary of UNESCO's Man and the Biosphere (MAB) Programme, Miguel Clusener-Godt, on the COVID-19 crisis I UNESCO I 10 April 2020/Will the next coronavirus come from Amazonia? Deforestation and the risk of infectious diseases (commentary) I Philip M. Fearnside I Mongabay I 8 April 2020/How biodiversity loss is hurting our ability to combat pandemics I John Scott I World Economic Forum I 9 March 2020, এ ছাড়া ক্লিক করা যেতে পারে : https ://www.genevaenvironmentnetwork.org/resources/updates/updates-on-covid-19-and-the-environment/

৩. জানি, করোনাভাইরাসের ফলে সৃষ্ট রোগের নাম 'কোভিড-১৯', যা বৈশ্বিক মহামারি তৈরি করেছে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এই মহামারিতে রোগের নাম নয়, রোগজীবাণু/ভাইরাসটির নামটিই প্রচলিত হয়েছে। যেমন কলেরা-বসন্ত-কালাজ্বর-হাম মহামারিগুলো রোগের নামেই অধিকতর পরিচিতি পেয়েছে। অধিকাংশ মানুষ আমরা হয়তো জানিই না কলেরার জীবাণুর কী নাম? কিংবা কালাজ্বর কেন হয়? বসন্ত বা হামের জীবাণুর নামই-বা কী? রোগের চেয়ে রোগজীবাণুর নামে কোনো মহামারির পরিচিতি কেন ঘটল, এ এক লম্বা গবেষণার বিষয় হতে পারে। পাবলিক পরিসরে অধিক পরিচিত

'করোনা মহামারি' প্রত্যয়টিই চলতি আলাপে ব্যবহৃত হচ্ছে। জানুয়ারিতে যখন করোনা বিষয়ে লেখালেখি শুরু করি, তখন 'করোনার কালে' শব্দটি ব্যবহার করতাম, মার্চ থেকে 'করোনাকাল' ব্যবহার শুরু করি।

৪. দেখুন : আইপিনিউজ, ২৯ মার্চ ২০২০, https ://ipnews.com.bd/14831/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6% BE%E0%A6%B8%E0%A7%80/ এবং দৈনিক *বণিক বার্তা*, ৮ এপ্রিল ২০২০

৫. দেখুন : https ://samakal.com/todays-print-edition/tp-special-feature/article/ 200435946/-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%96-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4% E0%A6%BF

৬. Morris, Carolyn Smith (2020), 'Indigenous peoples turning to traditional knowledge on COVID-19 response', এ-সম্পর্কিত একটিমাত্র লেখাই অনলাইনে খুঁজে পাওয়া যায়, যদিও এর আর কোনো আপডেট নেই। *Cultural Survival* তাদের ওয়েবসাইটে ১৬ এপ্রিল ২০২০ 'Indigenous peoples turning to traditional knowledge on COVID-19 response' শিরোনামে তথ্যসূত্রবিহীন লেখাটি প্রকাশ করে। ক্লিক করুন : https :// www.culturalsurvival.org/news/indigenous-peoples-turning-traditional-knowledge-covid-19-response

৭. দেখুন : Karmakar, Rahul. 2020, Arunachal's tribes revive indigenous lockdown rituals, The Hindu, 27 March 2020, click the link : https ://www.thehindu.com/ news/national/other-states/arunachals-tribes-revive-indigenous-lockdown-rituals/article31186665.ece

৮. দেখুন : Gokkon, Basten. 2020, Indigenous Papuans initiate own lockdowns in face of COVID-19, 6 April 2020, click the link : https ://news.mongabay.com/2020/04/ indigenous-papuans-initiate-own-lockdowns-in-face-of-covid-19/

৯. দেখুন : LAPNITEN, KARLSTON ON. 2020, In a Philippine indigenous stronghold, traditions keep COVID-19 at bay, 21 APRIL 2020, CLICK : https ://news.mongabay.com/2020/04/in-a-philippine-indigenous-stronghold-traditions-keep-covid-19-at-bay/

১০. দেখুন : Praeli, Yvette Sierra. 2020, South American indigenous peoples close territories in response to COVID-19, 14 April 2020 I Translated by Theo Bradford, click the link : https ://news.mongabay.com/2020/04/south-american-indigenous-peoples-close-territories-in-response-to-covid-19/

রাজনৈতিক অর্থনীতি

করোনা-উত্তর পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়ন

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

সারসংক্ষেপ

করোনাভাইরাসের কবলে হোঁচট খেয়েছে বিশ্বরাজনীতি এবং প্রায় থমকে গেছে বিশ্বঅর্থনীতি। আধুনিক কালে এত বড় দুর্যোগ এর আগে মানুষ দেখেনি, যার পরিসর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেকোনো মহাযুদ্ধের পরিসরকে ছাপিয়ে উঠেছে। ফলে বিজ্ঞজনেরা এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন এবং বলছেন তাঁদের নানা অভিমত। কিন্তু যে বিষয়ে তাঁরা প্রায় সবাই একমত, তা হলো করোনা-উত্তর পৃথিবী হবে নতুন পৃথিবী, আমূল পরিবর্তন আসবে সেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ধরনও হয়তো পাল্টে যাবে এবং প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বাজারব্যবস্থাও হয়তো নতুন সমীকরণ ও হিসাব-নিকাশের আওতায় আসবে। রাষ্ট্র ও মানুষের সম্পর্কের ধরনেও হয়তো আসবে পরিবর্তন এবং পশ্চিমা দুনিয়ার প্রচলিত নিওলিবারেলিজমও হয়তো তার গতিপথ পরিবর্তন করবে। প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্র নামক যে যন্ত্রটি হাজির বিশ্বে, তা-ও হয়তো প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। বিশ্বায়ন নামক ধারণাটিও হয়তো হয়ে উঠতে পারে অকার্যকর, কারণ, রাষ্ট্রগুলো হয়তোবা তাদের স্বার্থভিত্তিক নতুন মেরুকরণের সূচনা করবে। সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও উঠে এসেছে যে করোনা নামক যে ভাইরাস আপদ আকারে উপস্থিত হয়েছে, তা কি প্রকৃতির রোষ, যা প্রকৃতির ওপর মানবজাতির বিজয়ের নামে তার যথেচ্ছাচারের ফল? এই প্রবন্ধে লেখক এই সব গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকে ও বিভিন্ন সূত্রে এবং তাঁর নিজস্ব পর্যালোচনার ভিত্তিতে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

১.

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংকটের কারণে বিশ্বে মৃত্যু-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, বিশ্বে যে দেশগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থ ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় এগিয়ে, সেই দেশগুলোতে এই মহামারির তাণ্ডব সবচেয়ে বেশি। তবে পৃথিবীর কোনো প্রান্তই এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। পৃথিবী অপেক্ষা করছে এই মহামারি থেকে আরও কী কী বিপর্যয়ের সূত্রপাত হতে পারে, তা দেখার জন্য।

কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে যা যা হয়েছে, তা থেকেও আমাদের মনে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে। আমরা দেখলাম যে করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ামাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছুদিনের জন্য অভিবাসন বন্ধ করে দিয়েছেন, যদিও অনেকে মনে করছেন যে এই রুদ্ধদ্বার রুদ্ধ অবস্থায় আরও দীর্ঘকাল থাকতে পারে এবং পরে তা শিথিল হলেও আমেরিকার অভিবাসননীতি আরও কঠোর হতে পারে। জার্মানি ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে করোনাযুদ্ধে কিছুটা সফল হলেও অন্য ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এবং নোয়াম চমস্কি যে কারণে জার্মানদের স্বার্থপর আখ্যায়িত করেছেন।[১] ফলে এই বৈশ্বিক সংকটকালে এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার মৈত্রী কতটা মেকি, তা সবার সামনে নগ্ন হয়ে পড়েছে। এমনকি এই বীভৎসতা আরও প্রকট হয়, যখন আমরা বিবিসির খবরে পাই যে আমেরিকা বার্লিনের পুলিশ বাহিনীর জন্য জার্মানি কর্তৃক অর্ডারকৃত দুই লাখ এফএফপি-২ মাস্ক সমুদ্রপথ থেকে ছিনতাই করেছে।[২] ইতালি তার ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৬টি মিত্রের কাছে জরুরি সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে।[৩] সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্দার ভুচিচ এই ক্রান্তিকালে কোনো অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য ইউরোপীয় মুরব্বিদের কাছ থেকে না পেয়ে চীনের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং বলেছেন, European solidarity does not exist. That was a fairy tale on paper.[৪]

ফলে ব্রেক্সিটের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে বিষাদঘণ্টা বেজে উঠেছিল, করোনা ক্রান্তিলগ্নে কি তার চূড়ান্ত সময় ঘনিয়ে এল? এদিকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জার্মানি চীনের বিরুদ্ধে উহানে ভাইরাসের সংক্রমণ ও তার বিস্তারসম্পর্কিত পরিস্থিতি আগাম জেনেও সার্বিক তথ্য গোপনের অভিযোগ এনেছে এবং তার কাছ থেকে ১৩০ বিলিয়ন পাউন্ড দাবি করেছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তার চেয়ে চীন কট্টর জাতীয়তাবাদীর মতো তার নিজের ভাবমূর্তিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে এবং তাকে বিদেশিবিদ্বেষী বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। চীন অবশ্য তার দেশের মৃত্যুর সংখ্যা পরবর্তীকালে প্রথমোক্ত সংখ্যার দ্বিগুণ বলে স্বীকার করেছে।[৫] *নিউইয়র্ক পোস্ট* সরাসরি মন্তব্য করেছে যে চীনের কমিউনিস্ট সরকার মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য না দিলে এবং তথ্য গোপন না করলে ভাইরাস সংক্রমণ এত ব্যাপক আকারে হতো না।[৬] অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বচ্ছতার ঘাটতির অভিযোগ এনে সংস্থাটিতে আপাতত তাঁর দেশের অর্থায়ন বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে আসল কথা হলো সংস্থাটি মার্কিন নীতির সমালোচনা করেছিল। এ ছাড়া সংস্থাটির সেক্রেটারি জেনারেল তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস ফেব্রুয়ারিতে এই মহামারির ব্যাপক সংক্রমণের আগাম বার্তা দিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ

করেন।[৭] উন্নত দেশগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক অবিশ্বাস, চিন্তার অনৈক্য ও সমন্বয়ের অভাবে করোনা সংকট মোকাবিলা ক্রমেই আরও কঠিন হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বলছে যে এই সংকটের কারণে যে দুর্ভিক্ষ লাগতে পারে, তাতে বিশ্বে ৩ কোটি লোক প্রাণ হারাবে, আর *ফোর্বস*-এর জরিপে তা হবে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি।[৮] যাহোক, পরস্পরের ওপর আস্থা ও বিশ্বাসহীনতার ওপর দণ্ডায়মান যে মেকি বিশ্বায়নের সমালোচনা এতকাল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো করে আসছিল, তা এই সব ঘটনায় আরও নগ্নভাবে প্রকট হলো। ফলে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, এই যদি হয় বিশ্বায়ন তত্ত্বের প্রবক্তা ও হর্তাকর্তাদের চিন্তাগত অবস্থা, তাদের জাতীয়তাবাদী উন্নাসিকতার হাল এবং তাদের কাজের ধরন, তাহলে কি করোনা অধ্যায় বিশ্বায়ন নাটকের যবনিকাপাত ঘটাতে যাচ্ছে?

এ ছাড়া আরেক শ্রেণির মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, বিশেষত পশ্চিমের দেশগুলোতে, যারা বিশ্বায়নবিরোধী, যারা মনে করে বিশ্বায়নের কারণে পৃথিবীতে যে যোগাযোগব্যবস্থা ও নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ফলে করোনা দুনিয়ায় দ্রুত ছড়িয়েছে।[৯] এর ফলে এই প্রশ্ন অনেকের মনে দানা বেঁধেছে, করোনা-উত্তর পৃথিবীতে সামরিক ও অর্থনীতিভিত্তিক আরও নতুন নতুন আঞ্চলিক বা স্বার্থভিত্তিক জোটের আবির্ভাব ঘটবে কি বিশেষত এশিয়া, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায়?

২.

করোনা-আতঙ্ক বিশ্বের প্রচলিত সামরিক ও ভূরাজনৈতিক কৌশলের অসারতা প্রমাণ করেছে। এই অদৃশ্য শত্রুকে কনভেনশনাল অস্ত্র দিয়ে মোকাবিলার কোনো উপায় নেই। একক কোনো রাষ্ট্র বা পরাশক্তি, এমনকি কোনো প্রতিরক্ষা জোট এই শক্তিকে মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। যেমন সোভিয়েত যুগের ওয়ারশ বা হালের বিদ্যমান মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাটো জোট, যারা কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ বা স্বার্থের কারণে একতাবদ্ধ, তারা বিশ্বের সব দেশকে একত্রিত বা তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছে; বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়েছে এ রকম সামরিক জোটগুলো সামগ্রিকভাবে করোনা মোকাবিলা করতেও অক্ষম। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই ভাইরাস সব আধুনিক মারণাস্ত্রের অসারতা প্রমাণ করেছে। ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো তাদের নিজ নিজ দেশের দুয়ার রুদ্ধ করে বুঝিয়ে ছেড়েছে যে কোনো আদর্শ নয়, নিজের স্বার্থটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য এবং সে ক্ষেত্রে কেউই কোনো ছাড় দিতে রাজি নয়, যে কারণে করোনা-উত্তর যে নতুন অধ্যায় সূচিত হবে, সেখানে হয়তো অনেক অর্থ সামরিক খাত থেকে রোগনির্ণয় গবেষণায় স্থানান্তরিত হবে। গোয়েন্দাবৃত্তিতেও নানা পরিবর্তন আসবে, যার সবকিছু সবার জন্য সুখকর না-ও হতে পারে। বিভিন্ন দেশে (অবশ্যই সব দেশে নয়) সংখ্যালঘু ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এই ভাইরাস

একটি মোক্ষম অজুহাত হয়ে উঠবে। নিজ দেশের জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণে নানান নতুন প্রযুক্তির সমাহার ঘটবে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়, জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কথা বলে সেগুলো জায়েজ করার চেষ্টা হতে পারে। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ইউভাল নোয়াহ হারারি বলেছেন, সংকটকালীন যে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা সরকারগুলো নেবে, সংকট-পরবর্তীকালেও সেগুলো টিকে থাকবে বা কোনো কোনো দেশের সরকার সেগুলো টিকিয়ে রাখতে চাইবে। পুরো জাতি হয়ে উঠবে নিয়ন্ত্রণবাদীদের পরীক্ষাগারের গিনিপিগ। *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস*-এ হারারি লিখেছেন যে এমনকি অগ্রহণযোগ্য অনেক প্রযুক্তিও ব্যবহৃত হবে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করতে।[১০]

হারারি আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এই পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপকে আরও সহজ করে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন এবং চীনের উদাহরণ টেনে বলেছেন যে দেশটি বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করে ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা জানার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গতিবিধির নজরদারি করতেও সক্ষম হবে।[১১]

হারারি একটা হাইপোথিটিক্যাল উদাহরণ টেনেছেন এই বলে যে যদি কোনো রাষ্ট্র করোনা বা কোনো মহামারি প্রতিরোধে তার জনগণকে বায়োমেট্রিক মনিটরিংয়ের জন্য একটি বায়োমেট্রিক ব্রেসলেট পরতে বলে, তবে জনগণ নিজেই তার ওপর নজরদারির সুযোগ করে দেবে, নিয়ন্ত্রণবাদীদের জন্য তা এনে দেবে মোক্ষম ও কার্যকরী সুযোগ এবং তা কোনো বিতর্ক ব্যতিরেকেই।[১২]

আর ভবিষ্যতে করোনা-উত্তরকালেও এই নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার কী কী যুক্তি, বিশেষ করে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলো দেবে, তার আলামতও হারারি উপস্থাপন করেছেন তাঁর এক সাক্ষাৎকারে :

> Even when coronavirus cases are down to zero, some governments might argue that they need to keep the new surveillance systems because they fear a second wave of coronavirus, or because there is a new Ebola strain evolving in central Africa, or because they want to protect people from seasonal flu. Why stop with halting coronavirus?[১৩]

তবে ভবিষ্যতে কোনো রোগ বা মহামারির অজুহাতে ইউভাল নোয়াহ হারারি যেসব নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন, তা সব দেশেই যে হবে, তা নয়। তবে কোনো কোনো দেশে তা যে হবে, তা বোঝা যায়। ইতিমধ্যে লেখক ও মানবাধিকারকর্মী অরুন্ধতী রায় ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিশেষত তাবলিগ জামাতের নামে করোনা সংক্রমণের অভিযোগ তুলে সেখানে যে তাদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু হয়েছে, সে বিষয়ে মুখ খুলেছেন। জার্মান টেলিভিশন 'ডয়চে ভেলে'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরএসএস ও তার সংঘ পরিবারকে এমনকি তিনি নাৎসি বাহিনীর

সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা গণহত্যার ষড়যন্ত্র করছে। এ রকমভাবেই টাইফাস রোগের অজুহাতে জার্মান নাৎসিরা হলোকাস্ট কাণ্ডের প্রারম্ভে ইহুদিদের হত্যা করা শুরু করেছিল।[১৪] চীন উইঘুর মুসলিমদের ওপর আরও নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য খাতের নামে করোনার অজুহাত ব্যবহার করতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন। *দ্য ইকোনমিক টাইমস* পত্রিকার বরাতে এবং জাতিসংঘের আগাম আভাস থেকে জানা যাচ্ছে যে বিশ্বে করোনা-সম্পর্কিত বিপর্যয়ে ২৫ মিলিয়ন মানুষ চাকরি হারাবে।[১৫] যেকোনো কালেই সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মীয় উন্মাদনার ব্যবহার পুরোনো। ফলে করোনা-আতঙ্কের ধুয়া তুলে কি এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিগত নিপীড়ন ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রোশ আরও বাড়তে পারে? এই প্রশ্ন অনেকের।

৩.

নতুন নতুন সামরিক ও অর্থনীতিভিত্তিক আঞ্চলিক বা স্বার্থভিত্তিক জোটের আভাসের কথা যা পূর্বে আমরা বললাম, তা থেকেও প্রশ্ন উঠেছে, করোনার কারণে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার পরিণতি কী হবে। কারণ, এই সব আঞ্চলিক বা স্বার্থভিত্তিক জোটের বিশেষত সামরিক জোটের উৎপত্তির সূচনা সব সময়ই বিশেষত ইউরোপে হয়েছে বৃহত্তর জোটের ওপর আস্থাহীনতার কারণে। ভুলে গেলে চলবে না যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির ওপর ভিত্তি করে বিশ্বশান্তির জন্য একটা কার্যকর মঞ্চ তৈরি করার নিরিখেই ১৯২০ সালে লিগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাৎসি জার্মানি তাদের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে লিগ অব নেশনস তাদের স্বার্থের অনুকূলে নয় ভেবেই তারা ১৯৩৯ সালে মলোটোভ-রিবেনট্রপ প্যাক্ট গঠন করে। মূলত এর পরেই আডলফ হিটলার পোল্যান্ড দখল করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। অবশ্য ১৯৪১ সালে নাৎসি বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে ওই প্যাক্ট ভেঙে যায়। কিন্তু ১৯৩৯ সালেই জার্মানি, ইতালি ও জাপানের উদ্যোগে রোম-বার্লিন-টোকিও এক্সিস নামক প্রতিরক্ষা জোট গঠিত হয়, যা ইতিহাসে প্যাক্ট অব স্টিল নামে সর্বজনবিদিত।[১৬] এরপরই কিন্তু নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরোদস্তর দানা বাঁধে। এই সবকিছুই হয়েছিল লিগ অব নেশনসের প্রতি আস্থাহীনতা থেকে। বর্তমানেও অনেক দেশের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গঠিত জাতিসংঘের ওপর আস্থা নেই বলে মনে হয়। ফলে করোনাকালে বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক দুর্দশায় পড়লে বিবিধ আঞ্চলিক বা স্বার্থভিত্তিক জোটের উদয় হতে পারে। অর্থনীতিতে সংরক্ষণবাদ আরও বৃহৎ পরিসরে জেগে উঠতে পারে। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের সিনিয়র ভিজিটিং ফেলো ফিলিপ ল্যাগ্রেইন বলেছেন যে চীন যেহেতু এই মহামারির কেন্দ্র, তাই

আমেরিকা ইতিমধ্যেই এই ভাইরাসকে 'চীনা করোনাভাইরাস' ট্যাগ করে একধরনের চীনবিদ্বেষের সূত্রপাত ঘটিয়েছে, যা পশ্চিমা দেশসমূহের চীন থেকে পণ্য আমদানির ওপর কার্যকর বাধা আরোপণে ভূমিকা নেবে। আবার 'ভেক্টর অব ডিজিজ' আখ্যায়িত করে চীনের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয়, ইরানি, কোরিয়ানদের ভ্রমণ ও তাদের পণ্যের ওপর বিধিনিষেধ আরও কঠোরভাবে আরোপিত হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃশ্যত উন্মুক্ত বাজারনীতি অগ্রাহ্য করে ইতিমধ্যে জার্মানি ও ফ্রান্স দেশের মাস্ক আমদানির ওপর বাধা আরোপ করেছে। অন্যদিকে আমেরিকাও ইউরোপীয় শেনজেনভুক্ত দেশগুলোর ওপর ভ্রমণে বাধা আরোপ করেছে।[১৭] এখানেও যেসব দেশ পশ্চিমের অনুকূল নয়, যেমন ইরান বা উত্তর কোরিয়া, তাদের ওপর নানা বাধা আরোপণে করোনা-অজুহাত একটি কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠবে কি?

ইতিমধ্যে আমেরিকায় চীনা নাগরিক এবং এশীয় ছাত্রছাত্রীদের বর্ণবাদ ও বিদেশি বিদ্বেষের শিকার হতে হচ্ছে। আগে যে বর্ণবাদ ও বিদেশিবিদ্বেষ সুপ্ত ছিল, তা এই করোনাকালে নগ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে।[১৮]

মনে রাখতে হবে, এক দেশ একবার দরজা বন্ধ করলে পরে পরিস্থিতি ভালো হলেও তা আবার খোলা দুষ্কর হয়ে ওঠে। যেমন *গার্ডিয়ান*-এর বরাতে আমরা জানি, ২০১৫ সালে ইতালি থেকে ব্যাপক উদ্বাস্তুর সমাগম অস্ট্রিয়ায় হলে অস্ট্রিয়া তার দরজা বন্ধ করে। কিন্তু দুই বছর বাদে সেই পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটলেও দরজা কিন্তু আবার উন্মুক্ত হয়নি।[১৯] অন্যদিকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক্টরাল গবেষক ডানিয়েল জামোরা ও কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিকোলাস অলসেন মনে করেন, পশ্চিমে নিওলিবারেলিজমের বয়ান যেহেতু পপুলিস্ট, ফলে তা স্বভাবতই উগ্র দক্ষিণপন্থী এবং তা সহজাতভাবেই উগ্র জাতীয়তাবাদকে উসকে দেওয়ার প্রবণতা লালন করে।[২০]

ফলে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সবকিছুকে কেন্দ্র করে করোনাকালে এবং তারপরে আবার বিপজ্জনক মাত্রায় পৃথিবীতে বিশেষত ইউরোপে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে কি?

৪.

আমরা জানি যে আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণার ব্যাপারে জঁ-জাক রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) চিন্তা ইতিহাসে দাগ কেটেছে। তিনি মনে করতেন, সমাজের সঙ্গে মানুষের যে চুক্তি, তারই সম্প্রসারণ আধুনিক রাষ্ট্রের সঙ্গে তার নাগরিকের সম্বন্ধ। এই চুক্তির কারণে জনগণ তার আনুগত্যের বিনিময়ে রাষ্ট্রের কাছ থেকে মতপ্রকাশের অধিকারসহ সব সুবিধা ভোগ করে। একসময় রাষ্ট্রে তো দাসপ্রথাও ছিল, রাষ্ট্র তো দাসদেরও

খাওয়াত, তাহলে তারা সেখানে নাগরিক ছিল না কেন? ভুলে গেলে চলবে না যে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ দাস ও রেড ইন্ডিয়ানদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-১৮৬৫) পর, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে। যাহোক এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রুশো অনেক আগেই, তাঁর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* নামক জগদ্বিখ্যাত বইয়ে :

> Now a man who becomes the slave of another does not give himself : he sells himself, in exchange, at the very least, for his subsistence.[২১]

তার মানে, যেভাবে দাসরা নিজেদের বিকিয়ে দেয়, রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে নাগরিক কিন্তু নিজেকে সেভাবে বিকিয়ে দেয় না; তার অবস্থান সেখানে রাষ্ট্রের অংশীদার হিসেবে। রাষ্ট্র শুধু তার দেখভাল করে না, নাগরিকও তার মতামত প্রকাশ এবং রাষ্ট্রীয় কার্যে তার অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের পরিগঠনে ভূমিকা রাখে। যদি কোনো রাষ্ট্র প্রকৃত কোনো অভিযোগ ব্যতিরেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে কোনো নাগরিক বা কোনো গোষ্ঠীকে এই সব কার্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তবে কার্যত সেই রাষ্ট্র রুশোর দর্শনানুযায়ী রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করে না। সেখানে যেকোনো সময় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর আগ্রাসনের শিকার হতে পারে। সেখানে সংখ্যালঘুর অবস্থান দাসের চেয়ে খুব বেশি ভালো নয়। রুশো বলেছেন :

> The Greek captives in the cave of the Cyclops lived there peacefully, while awaiting their turn to be devoured.[২২]

অর্থাৎ রুশো নাগরিকত্বহীন দাসগোষ্ঠীকে হোমারের *ওডিসি* মহাকাব্যে বর্ণিত এক চক্ষুবিশিষ্ট দানব সাইক্লোপসের ভোগের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেখানে তার কাছে বন্দী অবস্থায় থাকা গ্রিক নাবিকেরা যেকোনো সময় তার খাদ্যে পরিণত হতে পারে। যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল, সেখানে একইভাবে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে সাইক্লোপসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে বলে আমরা মনে করতে পারি। এখন রাষ্ট্র যদি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে, তবে প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠের আক্রোশের শিকার হবে সংখ্যালঘু এবং সেখানে ধর্মীয় বা যেকোনো জাতিগত ব্যবধান একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু প্রবল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠও পার পাবে না। রাষ্ট্র শুধু কিছু গোষ্ঠীর স্বার্থ সেখানে দেখবে। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগেও তো সমাজ ছিল, যেখানে শুধু ধনী ও ক্ষমতাবানদের স্বার্থ রক্ষা করা হতো। তাহলে বুর্জোয়া আন্দোলনের দরকার কেন পড়ল, রাষ্ট্রব্যবস্থাই বা কেন কায়েম হলো? কারণ, রাষ্ট্র তার সব জনগণের স্বার্থ দেখার জন্য চুক্তিবদ্ধ। তার মানে কি এই দাঁড়ায় যে করোনায় আক্রান্ত বিশ্ব অর্থনীতি বেশি বিপর্যয়ে পড়লে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শুধু কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থই দেখবে? ফলে তার কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়বে; এমনকি বর্তমানে দৃশ্যমান যে রাষ্ট্রের কাঠামো, তা-ও ভেঙে পড়তে পারে?

৫.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, বিশেষত পশ্চিমে অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে সবল নিয়ামক হয়ে উঠেছিল নিওলিবারেলিজম। করোনা-উত্তরকালে এই নিওলিবারেলিজম বা নয়া উদারনীতিবাদের গতিপ্রকৃতি কী হতে পারে, তা নিয়ে অনেকে চিন্তা করছেন। নিওলিবারেলিজম অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আর বর্তমান দুনিয়ায় এই অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রধান সংবাহক চীন, যেটি একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হলেও অর্থনৈতিক বিবর্তনে সে এখন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ধারক ও বাহক এবং রাষ্ট্রীয় দর্শনের জায়গায় নিজে নিওলিবারেল না হয়েও এক অর্থে বর্তমানে নিওলিবারেলিজমের প্রাণদায়িনী শক্তির একটি। জাপান সেন্টার ফর ইকোনমিক রিসার্চ বলছে, ২০৬০ সালের মধ্যে চীন ও ভারত বিশ্ব অর্থনীতির এক-তৃতীয়াংশ জিডিপির অংশীদার হবে[২৩]; আর এই দুইয়ের মধ্যে চীনের প্রাধান্যই থাকবে বেশি। অথচ করোনার প্রথম অভিঘাতের শিকার গণচীন। ইতিমধ্যে চীনের অর্থনীতি গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে পৌঁছেছে। শুধু ২০১৯-এ করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে চীনে চার মিলিয়ন চাকরি কর্তন করা হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের তথ্যানুযায়ী, চীনের অর্থনীতির ৪২ শতাংশের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। রয়টার্স জানিয়েছে, এই সংকটের কারণে তিন মাসের মধ্যে চীনের প্রবৃদ্ধি ৬ থেকে কমে ৪ দশমিক ৫-এ নেমে আসবে (১ মার্চ, ২০২০ আল-জাজিরার রিপোর্ট এটি)।[২৪] চীন বিমান খাতে ১২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব হারাতে যাচ্ছে এ বছর। অবাধ বাণিজ্যনীতির এক বড় আর্থিক জোগানদার পর্যটনশিল্প, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিমানশিল্প। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারট্রান্সপোর্টেশন অ্যাসোসিয়েশনের বরাতে জানা যায়, বিশ্ব বিমান খাতে এ বছর ২৯ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার হারাতে যাচ্ছে। ভ্রমণ ও পর্যটনকেন্দ্রিক সব ব্যবসায় এর প্রভাব পড়েছে এবং ডোমিনো ইফেক্ট আকারে তা সামনে আরও বড় পরিসরে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জাপানে পর্যটনশিল্পের ওপর এই পরিস্থিতির ভয়াবহ প্রভাবের কথা ইতিমধ্যে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে।[২৫] ২০০৭-০৯ পর্যন্ত যে ভয়াবহ ফিন্যান্সিয়াল সংকট অতিবাহিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে, তার রেশ কাটতে না-কাটতে শুরু হলো এই করোনা বিপর্যয়। ফলে তীব্র অভিঘাত রচিত হলো নিওলিবারেল পুঁজিবাদের ওপর, যে নিওলিবারেল পুঁজিবাদ সম্পর্কে সোয়াসের অর্থনীতির অধ্যাপক কোসটাস লাপাভিটসাস লিখেছেন :

> An economic system based on competition and naked profit-seeking—both guaranteed by a powerful state—proved incapable of dealing calmly and effectively with a public health shock of unknown severity.[২৬]

লকডাউন ও আইসোলেশনের দৌরাত্ম্যে পণ্যের সৃজন, সংবহন ও বিতরণ

সংকুচিত হয়ে আসাতে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোও গণস্বাস্থ্যের ওপর ঘনিয়ে আসা এই মহা-আপদ মোকাবিলা করতে সামগ্রিক অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎস বলেছেন যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারগুলোতে তাদের অবস্থান যত শক্তিশালীই দাবি করুক, কোনো ব্যাংকই এই সংকট থেকে পার পাবে না।[২৭]

নিওলিবারেলিজমের প্রধান তাত্ত্বিক ভিত্তি বিশেষত অর্থনৈতিক বয়ানের ভিত্তি আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর প্রধান তিন তাত্ত্বিক গুরুর দুজন দুই নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান (১৯১২-২০০৬) এবং ফ্রেডরিখ অগাস্ট ফন হায়েক (১৮৯৯-১৯৯২)। আর শেষ ব্যক্তিটি হেনরি কালভের্ট সিমন্স (১৮৯৯-১৯৪৬)। পরে অবশ্য এ বিষয়ে আরও রথী-মহারথীর আবির্ভাব বিশ্বজুড়ে হয়েছে, যেমন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জগদীশ নাতওয়ারলা ভগবতী (১৯৩৪-)। চিন্তার ক্ষেত্রে নিওলিবারেল দর্শনে নানা মতভেদ থাকলেও এতে সাধারণ কতগুলো ঐকমত্যের জায়গা তাঁদের মধ্যে আছে। যেমন নিওলিবারেলিজম মূলত মুক্তবাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতি। এর মতাদর্শিক গুরুরা মনে করেন, বাজার উন্মুক্ত থাকলেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ব্যবসায়ীরা তাঁদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করবে, এতে পণ্যের মান হবে ভালো এবং তার দাম হবে যথার্থ। ফলে এগুলো নিশ্চিত করতে প্রতিযোগিতা হতে হবে সীমাহীন। সরকারি হস্তক্ষেপ প্রতিযোগিতার মনোভাব নষ্ট করে, সেই সঙ্গে সম্ভাব্য উপযুক্ত প্রতিযোগীকে বাজারে অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। যদি বাজার অগণতান্ত্রিক সরকারের হাতে পড়ে, তবে তা একচেটিয়া কারবারের জন্ম দিতে পারে। আর বাজার স্বচ্ছ এবং মুক্ত থাকলেই সম্পদের সবচেয়ে সার্থক বিতরণ সম্ভব হয়।[২৮] কার্যত আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় মুক্তবাজারের এই সব সবক কতটা কাজ করে, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু তারপরও মুক্তবাজারতত্ত্ব যদি কিছুটা কাজ করেও, এখন লকডাউনের কারণে আন্তর্জাতিক বাজার সংকুচিত হয়ে পড়াতে পণ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সম্পদের সার্থক বিতরণ যদি বাধাগ্রস্ত হয়, তবে মুক্তবাণিজ্য যেটুকু আছে, তা-ও বিপন্ন হবে। এতে যে মন্দা দেখা দেবে, অনেকের মতে তা গত শতকের ত্রিশের দশকের গ্রেট ডিপ্রেশন বা মহামন্দা এবং ২০০৫-২০০৮ পর্যন্ত স্থায়ী মহামন্দাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। ফলে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেখা দেবে পারস্পরিক অনাস্থা। তার কিছু আলামত ইতিমধ্যে ইউরোপসমেত নানা অঞ্চলে দেখা গেছে। যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতালির স্থানীয় প্রতিনিধি মাউরিৎসিয় মাসারির তাদের মিত্র দেশগুলো থেকে মেডিকেল সরঞ্জামপ্রাপ্তির ব্যর্থতা *আল-জাজিরায়* বর্ণনা করেছেন।[২৯]

এই সাহায্যপ্রাপ্তির ব্যর্থতা ইতালীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্যকারিতা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন।[৩০]

এখন পরিস্থিতি যদি আরও খারাপ হয়, সে ক্ষেত্রে কি সামনে নিওলিবারেলিজমকে পশ্চিমে আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে?

৬.

করোনাভাইরাসের কারণে আগাম মহামন্দার সঙ্গে বিশ্বে দারিদ্র্য বৃদ্ধির কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্বব্যাংক বলছে যে এই ভাইরাসের কারণে জিডিপির নিম্নমুখিতার কারণে পণ্যের জোগান ও চাহিদা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছে।[৩১]

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশের মহামারির কারণে সৃষ্ট এই সংকট দীর্ঘ মেয়াদে মোকাবিলার সামর্থ্য নেই। বেশির ভাগ দেশ লকডাউনে চলে গেছে, ফলে সরবরাহ লাইন মহাবিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ ও দরিদ্র দেশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা দুরূহ।

অন্যদিকে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করেছেন যে চরমপন্থী মতাদর্শীরা ইতিমধ্যে করোনাকালে তাদের দিকে তরুণদের ঝুঁকতে অনুপ্রাণিত করছে। তার কারণ হিসেবে তিনি দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা এবং বিশ্বময় নানা রকম সংঘাতকে দায়ী করেছেন, যা করোনাকালে আরও বাড়বে এবং তরুণদের আরও হতাশা ও সংঘাতের দিকে তাড়িত করবে।[৩২]

জোসেফ স্টিগলিৎজ আমেরিকার স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় এই ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে।[৩৩]

এই বরাতে সিএনবিসিতে জেসে পাউন্ড লিখেছেন যে আর্থিক সামর্থ্যের ব্যবধানের কারণে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও ধনীদের সঙ্গে বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ এবং অন্য দরিদ্র ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে ব্যবধান রচিত হচ্ছে।[৩৪]

অনেকে তাই প্রশ্ন তুলেছেন, করোনা সংকট কি ধনী-দরিদ্র এবং জাতিগত বৈষম্য আরও প্রকট করবে?

৭.

ক্লাউস শোয়াব (Klaus Schwab) যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন, তার সম্ভাবনার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তৃতীয় শিল্পবিপ্লব হয়েছিল যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপকতার জোরে; কিন্তু চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জোয়ার আসবে আরও ব্যাপক আকারে, যার ক্রমিক উৎকর্ষ আসবে রৈখিকভাবে নয়, সূচক আকারে, আর তার ব্যাপক ছাপ পড়বে সামগ্রিক উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও শাসনপ্রক্রিয়ার ওপর।[৩৫] বলা হচ্ছে এটি শুধু প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন হবে না, বরং হবে তার চেয়েও বেশি কিছু। নেতৃত্ব, পরিকল্পনা প্রণয়নে তা বিবিধ গতি সঞ্চার করে ও দুনিয়ার সব মানুষকে সক্রিয় করে এর মাধ্যমে

মানবজাতির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটানো হবে।[৩৬]

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং, ন্যানোপ্রযুক্তি, রোবটিকস, ড্রোন ইত্যাদি এই শিল্পবিপ্লবের পালে আরও হাওয়া লাগাবে। পরিবেশগত উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিশ্বে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ইত্যাকার স্বপ্ন এই ধারার সমর্থকেরা দেখিয়ে আসছেন। কিন্তু যাঁরা এর সমালোচক, তাঁরা বলছেন যে এই বিপ্লবের কারণে শ্রমিকের ব্যবহার কমে যাবে, ফলে বেকারত্ব বাড়বে, প্রচুর শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তিগত বর্জ্য বাড়বে, ধনী-দরিদ্র ব্যবধানও আরও ব্যাপক হবে। তবে করোনা সংকটে বৈশ্বিক অর্থায়ন ব্যবস্থা, পণ্য সরবরাহ, বিপণনকাঠামো নড়বড়ে হয়ে যাওয়াতে প্রশ্ন উঠেছে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিকট ভবিষ্যতে আর সম্ভব হবে কি না? আর তা যদি সম্ভব হয়ও ,তার সুফল ভোগকারী কি হবে বিশ্বের সীমিতসংখ্যক মানুষ?

৮.

জোসেফ স্টিগলিৎসের মতে, দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে যারা অর্থনৈতিক মানদণ্ডে সবলতর, তারা মূলত রপ্তানিনির্ভর। কিন্তু বৈশ্বিক অর্থায়ন সংকুচিত হলে পণ্যের দরপতন হবে, প্রাকৃতিক সম্পদের বাজারও ধসের মুখে পড়বে। ফলে কেউ রক্ষা পাবে না।[৩৮]

লকডাউনের কারণে এখন রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি স্থবির। লকডাউন উঠে গেলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বাভাবিক হতে কত সময় লাগবে, তা বলা মুশকিল। ইতিমধ্যে যাঁরা শ্রমজীবী, যেমন বাংলাদেশে, লকডাউনের কারণে তাঁরা কাজ থেকে বঞ্চিত এবং যাঁরা খুদে ব্যবসায়ী, তাঁরাও বিপর্যস্ত। তাহলে প্রশ্ন উঠেছে, এই সংকট কি বিশ্বে দরিদ্রের সঙ্গে সঙ্গে অতিদরিদ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি করবে?

৯.

খ্যাতনামা দার্শনিক জিজেক (Slavoj iek) করোনা সংকটের কারণ ও তার বিস্তার হিসেবে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, তা ছাপিয়েও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রশাসন ও জনগণের মধ্যকার অবিশ্বাসের কথা বলেছেন। তিনি প্রসঙ্গ টেনেছেন চীনের, যে দেশে এই মহামারির প্রাদুর্ভাব প্রথম দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি এবং এই করোনাকালেই লেখা *প্যানডেমিক! কোভিড-১৯ শেকস দ্য ওয়ার্ল্ড* বইয়ে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, যদি চীন কট্টর নিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র না হতো, তবে সে সহজেই নিজ জনগণকে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বময় ভাইরাসটির বিষয়ে জানিয়ে তাদের সতর্ক করত এবং পৃথিবীব্যাপী ভাইরাসটি ছড়ানোর আগেই তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হতো। তিনি হংকংয়ের সাংবাদিক ভেরনা ইউর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এ কথা বোঝাতে যে দেশে বাক্‌স্বাধীনতা না থাকলে, গণতন্ত্রের প্রকাশ না থাকলে চীনে কিংবা অন্য কোথাও এ রকম মহামারির আরও প্রকোপ ঘটতে পারে।[৩৯] বর্তমান

অতিরক্ষণশীল ও স্বৈরতন্ত্রী চীন মাওপন্থী কি না, তা নিয়েও জিজেক প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ, মাও বলেছেন, জনগণকে বিশ্বাস করো, অথচ সেই আদর্শ এখন সেখানে পার্টির স্বৈরতান্ত্রিক আচরণে অদৃশ্য। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ এখন চূড়ান্ত সংরক্ষণবাদী ও পলিটব্যুরোকেন্দ্রিক একটি গোষ্ঠীর প্রতি আনত, ফলে সে নিজ স্বার্থে কট্টর নিওলিবারেলদের মতোই আচরণ করবে। সে ক্ষেত্রে সে মাওকেও ছাড়বে না এবং অনেক মাওপন্থী ওয়েবসাইট তারা ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে।[৪০]

তবে জিজেক ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কথা বলেছেন যে করোনাকালের শুরুতেই তিনি ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। কারণ ফিলিস্তিনিরা আক্রান্ত হলে ইসরায়েলিরাও রক্ষা পাবে না।[৪১]

এই জায়গায় জিজেক কৃষ্ণাঙ্গদের ও শ্রমিক স্বার্থ আদায়ের মহান নেতা মার্টিন লুথার কিংয়ের উক্তি উল্লেখ করেছেন :

> As Martin Luther King put it more than half a century ago, 'We may have all come on different ships, but we're in the same boat now.'[৪২]

কিন্তু এই সব মৈত্রী তো আপৎকালের কৌশলগত মৈত্রী। আপৎকাল কেটে গেলে তো এই মৈত্রী আর কাজ করবে না। আর দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে আপৎকালে পুরোনো মৈত্রীও যে কাজ করছে না, সে বিষয়ে তো আমরা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। তাই প্রশ্ন উঠতেই পারে, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের এই অবিশ্বাস করোনা-উত্তরকালে আরও বাড়বে কি?

১০.

অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে, প্রকৃতির প্রতি আমরা সভ্য মানুষেরা যে অনাচার করেছি, তারই প্রতিফল কি আমরা পাচ্ছি? আমরা যে বায়ুদূষণ ঘটিয়েছি, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি করেছি, রেইনফরেস্ট ধ্বংস করেছি, তাতে কি মাতা ধরিত্রী চুপচাপ বসে থাকবেন? শেই কুলান লিখেছেন :

> You might say these diseases are the revenge of nature. The natural world is striking back at the disastrous human exploitation of the rain forests, the oceans and all wildlife by driving them to extinction. There is destruction in almost every habitat in the developing world and in some parts of the developed world, too. Illegal trade and trafficking in many endangered animal species for huge profit could be the cause of Coronavirus.[৪৩]

আর ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বহুকাল আগেই লিখেছিলেন,আমাদের নিজেদের প্রকৃতির ওপর বিজয়ের সুবাদে আত্মপ্রসাদে ভোগা উচিত নয়। ওই প্রতিটি বিজয়ে সে একটি করে প্রতিশোধ নেয়। প্রতিটি বিজয়ের একটি পরিণাম আমরা আন্দাজ

করতে পারি, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে তার চরিত্র হয় ভিন্ন, ভবিষ্যদ্বাণীর ঊর্ধ্বে তার পরিণামগুলো প্রায়ই আন্দাজ করা প্রথমটিকে বাতিল করে দেয়।[৪৪]

তথ্যসূত্র :

১. Noam Chomsky : 'Coronavirus pandemic could have been prevented' https ://www.aljazeera.com/news/2020/04/noam-chomsky-coronavirus-pandemic-prevented-200403113823259.html

২. করোনাভাইরাস : যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাস্ক ডাকাতির অভিযোগ https ://www.bbc.com/bengali/news-52166505?fbclid=IwAR1 RJ9eESwj 7EawVWzS7yEgH8SNi8IVzr2D1d9KNgH3qXRPa3KwyMcFZHxw

৩. https ://foreignpolicy.com/2020/03/12/coronavirus-killing-globalization-nationalism-protectionism-trump/

৪. Serbia turns to China due to 'lack of EU solidarity' on coronavirus by By Julija Simi | EURACTIV.rs https ://www.euractiv.com/section/china/news/serbia-turns-to-china-due-to-lack-of-eu-solidarity-on-coronavirus/

৫. China furious as leading German newspaper writes out 130BN bill for 'coronavirus damages by Oli Smith. https ://www.express.co.uk/news/world/1271028/Angela-Merkel-Germany-China-coronavirus-blame-Wuhan-Xi-Jinping-Trump-latest?fbclid=IwAR0EXw0ke-zA7yUWqG7FDZK8AQToX4G_HS0jqwppFqYusm LH9m VEGi7ZMaU

৬. China's deadly coronavirus-lie co-conspirator — the World Health Organization by Nicholas Eberstadt and Dan Blumenthal.https ://nypost.com/2020/ 04/02/ chinas-deadly-coronavirus-lie-co-conspirator-the-world-health-organization/?fbclid=IwAR0zeh_8HVxaxbDyg2jff7nJX3-WkjQmFihv DFLY5uxyF8HuYhUaAm_wsrM

৭. Trump pledges to put a hold on U.S. funding for the World Health Organization by Nicholas Florko. https ://www.statnews.com/2020/04/07/trump-hold-who-funding/

৮. The Newyork Times. https ://www.nytimes.com/aponline/2020/04/21/ world/ middleeast/ap-un-virus-outbreak-un-hunger.html https ://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/02/05/ai-predicts-coronavirus-could-infect-25b-and-kill-53m-doctors-say-thats-not-credible-and-heres-why/#34131cb911cd

৯. In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership by Yuval Noah Harari. https ://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/

১০. The world after coronavirus by Yuval Noah Harari. https ://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

১১. উপরোক্ত

১২. উপরোক্ত

১৩. The corona crisis is a human failure; an interview of professor Yuval Noah Harari by Inkstone https ://www.inkstonenews.com/health/coronavirus-crisis-human-failure-yuval-noah-harari-says/article/3078284

১৪. Novelist Arundhati Roy claims pandemic exposes India's crisis of hatred against Muslims. https ://www.dw.com/en/arundhati-roy-claims-coronavirus-exposes-indias-crisis-of-hatred-against-muslims/a-53167812?fbclid=IwAR322y4K_4anHrXABNCSbH4KfOcOaxtS1-nDXobTML7mVe-g5Yd7V_YAqPE

১৫. About 25 million jobs could be lost worldwide due to coronavirus : United Nations. https ://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/about-25-million-jobs-could-be-lost-worldwide-due-to-coronavirus-united-nations/articleshow/74705919.cms?from=mdr

১৬. https ://en.wikipedia.org/wiki/Pact_of_Steel https ://en.wikipedia.org/wiki/Axis_powers

১৭. The Coronavirus Is Killing Globalization as We Know It by Philippe Legrain. *Foreign Policy*. https ://foreignpolicy.com/2020/03/12/coronavirus-killing-globalization-nationalism-protectionism-trump/

১৮. The Coronavirus Panic Exposes the Pathology of Nationalism, 'The idea of America First, the nationalist populism, is against everything that we believe in in global health,' by Sonali Kolhatkar. https ://www.commondreams.org/views/2020/02/07/coronavirus-panic-exposes-pathology-nationalism

১৯. Coronavirus has sparked a perfect storm of nationalism and financial speculation by Yanis Varoufakis. https ://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/08/coronavirus-nationalism-economy-wall-street

২০. How Decades of Neoliberalism Led to the Era of Right-Wing Populism by Daniel Zamora and Niklas Olsen. Jacobin. https ://www.jacobinmag.com/2019/09/in-the-ruins-of-neoliberalism-wendy-brown

২১. Roussseau, Jean-Jaques. 1994 ed. *Discourse on the Political Economy and the Social Contract*. Translated by Christopher Betts. p.49. Oxford University Press.

২২. উপরোক্ত, p-49-50

২৩. China and India to make up one-third of global GDP in 2060 : JCER. By Sumio Saruyama and Kengo Tahara.*Nikkei Asian Review*, https ://asia.nikkei.com/ Economy/China-and-India-to-make-up-one-third-of-global-

GDP-in-2060-JCER

২৪. How the coronavirus outbreak is affecting the global economy. Aljajeera News. https ://www.aljazeera.com/programmes/countingthecost/2020/02/coronavirus-outbreak-affecting-global-economy-200229125804909.html I Economic impact of coronavirus outbreak deepens, The *Gurdian*. https :// www.theguardian.com/business/2020/feb/23/economic-impact-of-coronavirus-outbreak-deepens

২৫. https ://en.wikipedia.org/wiki/Socio-economic_impact_of_the_2019%E2%80%9320_coronavirus_outbreak

২৬. This Crisis Has Exposed the Absurdities of Neoliberalism. That Doesn't Mean It'll Destroy It. By Costas Lapavitsas. Jacobin. https ://www.jacobinmag.com/2020/03/coronavirus-pandemic-great-recession-neoliberalism

২৭. The coronavirus outbreak is a 'different kind of crisis,' says Nobel laureate Joseph Stiglitz. By Huileng Tang. https ://www.cnbc.com/2020/03/17/joseph-stiglitz-coronavirus-outbreak-is-a-different-kind-of-crisis.html

২৮. Neoliberalism. Encyclopaedia Britannica. https ://www.britannica.com/topic/neoliberalism

২৯. The Shifting Geopolitics of Coronavirus and the Demise of Neoliberalism-(Part 1) by Mohammed Cherkaoui. *Aljazeera News*. https ://studies.aljazeera.net/en/reports/shifting-geopolitics-coronavirus-and-demise-neoliberalism-%E2%80%93-part-1#e2

৩০. উপরোক্ত

৩১. Poverty and Distributional Impacts of COVID-19 : Potential Channels of Impact and Mitigating Policies. https ://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/ poverty-and-distributional-impacts-of-covid-19-potential-channels-of-impact-and-mitigating-policies

৩২. UN chief : Extremists using COVID-19 to recruit online youths By Edith M. Lederer https ://www.kaaltv.com/national-news/un-chief-extremists-using-covid-19-to-recruit-online-youths/5711958/

৩৩. Economist Joseph Stiglitz says coronavirus is 'exposing' health inequality in US by Jesse Pound. https ://www.cnbc.com/2020/04/14/economist-joseph-stiglitz-says-coronavirus-is-exposing-health-inequality-in-us.html

৩৪. উপরোক্ত

৩৫. The Fourth Industrial Revolution : what it means, how to respond by Klaus Schwab https ://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

৩৬. Forth Industrial Revolution. https ://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution

৩৭. The Fourth Industrial Revolution by Klaus Schwab. *World Economic Forum.* https ://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab

৩৮. Internationalizing the Crisis By Joseph E. Stiglitz. *Project Syndicate.* https ://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-impact-on-developing-emerging-economies-by-joseph-e-stiglitz-2020-04

৩৯. iek, Slavoj.2020. *Pandemic! Covid-19 shakes the world.* p.7. Or Books. Newyork London

৪০. উপরোক্ত p.9

৪১. উপরোক্ত p. 14-15

৪২. পূর্বোক্ত p.15

৪৩. The Revenge of Nature - Coronavirus? By Fr Shay Cullan, *Indipendent Catholic News.* https ://www.indcatholicnews.com/news/39029

৪৪. Engels, Friedrich.2001 ed. *Dialectics of Nature.* chapter.9. Marx Engels Archive.

মহামারি

মহামারি : ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি

শাহাদুজ্জামান

বিশ্বজুড়ে একটা আতঙ্কের ছায়া এখন ছড়িয়ে আছে করোনাভাইরাসের মহামারিকে কেন্দ্র করে। চীনে এর উৎপত্তি হলেও এই অভূতপূর্ব ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। এ ভাইরাসের রূপ, প্রতিকার, প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে অবিরাম চলছে তর্ক-বিতর্ক ও গবেষণা। করোনা মহামারির চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত জরুরি মেডিকেল পর্যালোচনার সমান্তরালে নজর দেওয়া যাক মহামারি বিষয়টির সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রার দিকেও।

স্মরণ রাখা দরকার যে সাধারণ রোগের সঙ্গে মহামারির মূল চরিত্রগত কতগুলো পার্থক্য আছে। সাধারণ রোগ ব্যক্তি অভিজ্ঞতার একটি বিষয়, কিন্তু মহামারি একটি যৌথ অভিজ্ঞতার অংশ। একটি রোগ যখন ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পুরো জনগোষ্ঠীকে আক্রান্ত করে, তখন সেটি মহামারিতে রূপ নেয়। মহামারির মূল জীবাণুর উৎস প্রায়ই হয়ে থাকে প্রাণিজগতে। আক্রান্ত প্রাণীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের কারণে মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ব্যাপক বিস্তার ঘটতে থাকে। পুরো জনগোষ্ঠী রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে বলে মহামারির কারণে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিঘাতের সৃষ্টি হয়। যেকোনো মহামারির ক্ষেত্রে একধরনের আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। প্রায়ই দেখা যায়, এ আতঙ্কের সূত্র ধরে কোনো একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে এই মহামারির জন্য দায়ী করে একধরনের দোষারোপের সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়। মহামারির অভিঘাত কোথায়, কেমন হবে, কে নাজুক অবস্থায় থাকবে, কাকে দোষারোপ করা হবে, সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ কোথায়, কখন ব্যবহৃত হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করবে জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর। মহামারির স্বাস্থ্য ও শারীরিক ঝুঁকির পাশাপাশি এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মাত্রাটির দিকেও তাই আমাদের নজর দেওয়া দরকার। সম্প্রতি করোনাভাইরাস মহামারির সামাজিক ও

রাজনৈতিক মাত্রাটি বুঝতে মহামারির দূর ও নিকট অতীতের অভিজ্ঞতার দিকেও খানিকটা নজর দেওয়া যাক।

দূর অতীত

দেখা গেছে, মানবজাতির ইতিহাস পরিক্রমায় মহামারির একটি বড় ভূমিকা আছে। মধ্যযুগে চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্লেগের যে মহামারি হয়েছিল, তাতে বদলে গিয়েছিল পুরো ইউরোপের ইতিহাস। 'ব্ল্যাক ডেথ' নামের সেই মহামারিতে প্রতিদিন প্রায় ৮০০ লোক মারা যেতে থাকে এবং ১৩৪৭ থেকে ১৩৫১ সন পর্যন্ত চলা সেই মহামারিতে ইউরোপের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী মৃত্যুবরণ করে। এ রোগ মূলত ছড়ায় ইঁদুর থেকে। সে সময় এ রোগকে ঈশ্বরের অভিশাপ হিসেবে দেখা হয় এবং দরিদ্র আর ইহুদিদের এ রোগের জন্য দায়ী করা হয়। বিস্তর ইহুদি নিধনের ঘটনা ঘটে সে সময়। কৃষকদের ব্যাপক মৃত্যুর কারণে ইউরোপের কৃষি অর্থনীতিতে ধস নামে এবং শিল্প অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে। এ সময় ইউরোপে, বিশেষ করে ব্রিটেনে মূলত বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। কৃষির বদলে ভেড়া পালনের মাধ্যমে উল উৎপাদন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এই ব্ল্যাক ডেথ সমাজে চার্চের সর্বব্যাপী প্রভাবকেও আঘাত করে। চার্চকে মানুষ এর আগে সব সমস্যার প্রতিকারের কর্ণধার হিসেবে দেখলেও, এই প্লেগ মহামারিতে তাদের অসহায়ত্ব চার্চের ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এ সময় শরীরের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা আধ্যাত্মিকতার বলয় থেকে বেরিয়ে যুক্তির বলয়ে ঢোকে। অনেক গবেষক মনে করেন, ইউরোপীয় রেনেসাঁর সূত্রপাতের সঙ্গে এই প্লেগ মহামারির উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।

ইউরোপে এ রকম আরেকটি বড় মহামারির ঘটনা ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই মহামারি কলেরার। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো, এই মহামারির সূত্রপাত হয়েছিল এই বাংলা অঞ্চল থেকেই, যার নাম ছিল 'বেঙ্গল কলেরা'। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে তখন ইউরোপের উপনিবেশ। ঔপনিবেশিক বাণিজ্য এবং সেনাবাহিনীর সূত্র ধরে ভারত অঞ্চল থেকে ইউরোপের প্রধান সব শহরকে এই রোগ ছড়ায়। ১৮৩০ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি কলেরা মহামারিতে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ইউরোপ তখন জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রগতির নানা উৎসব করছে পৃথিবীব্যাপী, কিন্তু সেই সময় কলেরার মতো একটা 'বর্বর' অসুখ তাদের যাবতীয় অহংকারকে ধূলিসাৎ করে দেয়। ইউরোপীয় চিকিৎসাব্যবস্থার নানা উন্নতি হলেও কলেরার কোনো চিকিৎসা তাদের হাতে ছিল না। এই মহামারির ক্ষেত্রে যথারীতি দায়ী করা হয় ঔপনিবেশিক দেশের মানুষকে। মূলত ভারতীয়দের। ভারতীয়দের নোংরা জীবনযাপন, বিশেষ করে

নানা তীর্থকেন্দ্রের জনসমাগমকে এই মহামারির জন্য দায়ী করা হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই কলেরা মহামারির সূত্রে নানা আইন করে ভারতের তীর্থকেন্দ্রগুলোর কর্মকাণ্ডগুলোর ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই মহামারির ফলেই ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতের সনাতন আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসাকে বেআইনি করে এবং অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকে বাধ্যতামূলক করে। সেই সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর এই কলেরা মহামারির পর ভারতে মিশনারিদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন বৈধ হিসেবে ঘোষণা করে। হিন্দুধর্মের নানা রীতি-আচারকে মহামারির জন্য দায়ী করে খ্রিষ্টীয় মিশনারিরা খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন এবং স্থানীয় মানুষকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর কলেরা মহামারি ঔপনিবেশিক ভারতের প্রশাসন, চিকিৎসা ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভারতীয় উপমহাদেশে স্মল পক্স বা গুটি বসন্তের মহামারিরও ব্যাপক রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে, যা এ নিবন্ধের আলোচনার বাইরে রইল।

ইউরোপের মূল ভূমির সামাজিক জীবনেও এই কলেরা মহামারির ব্যাপক অভিঘাত ঘটে। ইউরোপেও এই মহামারি ছড়ানোর জন্য দরিদ্র মানুষ এবং তাদের জীবনযাপনকে দায়ী করা হয়। এই মহামারির পর ধনী ও দরিদ্র পাড়ার মধ্যে ব্যাপক ভৌগোলিক দূরত্বের সৃষ্টি হয়। ধনবানেরা শহরের দরিদ্র এলাকা থেকে সরে গিয়ে দূরে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। এই মহামারির কারণে শহরের স্থাপত্যেরও বড় পরিবর্তন ঘটে। নতুন করে পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থা তৈরি হয়। ইউরোপের আধুনিক শহরগুলো গড়ে ওঠার পেছনে এই কলেরা মহামারির ভূমিকা রয়েছে। এই মহামারির সূত্র ধরে পাবলিক হেলথ বা 'জনস্বাস্থ্য' নামে এক নতুন জ্ঞানকাণ্ডের সূচনা হয়। কলেরা মহামারি ইউরোপে নানা সামাজিক বিদ্রোহেরও জন্ম দেয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, চিকিৎসার অভাব ইত্যাদি কারণে ইউরোপের কলেরা মহামারিতে মূলত দরিদ্র মানুষই বেশি আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। এ সময় ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশে এমন সব আইন করা হয়, যাতে দরিদ্র মানুষ আরও প্রান্তিক হয়ে পড়ে। যেমন দরিদ্র মানুষকে কড়া পুলিশি নজরদারিতে রাখা হয়, যাতে তারা বাজারের মালপত্রে হাত দিতে না পারে, কোনো ভদ্র পাড়ায় না ঢোকে ইত্যাদি। অসুস্থ হলে তাদের জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

এসব কারণে তখন এমন একটি ধারণা জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয় যে এ রোগ হয়তো ধনবানদের ষড়যন্ত্র। গুজব ওঠে যে ধনীরা দরিদ্রদের নির্মূল করতে চায়। মহামারিকে কেন্দ্র করে সমাজের নানা সুপ্ত অসন্তোষের ক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন। মহামারি চলাকালে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও হাঙ্গেরিতে ব্যাপক জনবিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। সেই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার, বিশেষ করে আমেরিকায়

ইউরোপীয়দের উপনিবেশের পেছনে মহামারি একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। ইউরোপীয়রা আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে এমন সব রোগ নিয়ে হাজির হয়, যার বিরুদ্ধে সেখানকার আদিবাসীদের কোনো প্রতিরোধক্ষমতা ছিল না। ফলে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকদের মাধ্যমে আসা রোগ মহামারি আকারে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে সেখানে মৃত্যুবরণ করে লাখ লাখ মানুষ। এতে ইউরোপীয়দের পক্ষে সেই সব ভূমি দখল সহজ হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক নথিপত্রে জানা যায়, কলম্বাসের সঙ্গীসাথিরা আমেরিকার মাটিতে স্মল পক্স এবং মিসেলস রোগ বয়ে নিয়ে যায়, যা সেখানকার স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়লে কয়েক বছরের মধ্যেই আদিবাসীদের জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। সুতরাং বলা যায়, আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও রোগের জীবাণু ওই সব দেশে উপনিবেশ স্থাপনে ঔপনিবেশিক শাসকদের সহায়তা করেছে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঐতিহাসিকভাবেই মহামারির একটা স্পষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক যোগসূত্র রয়েছে।

নিকট অতীত

নিকট অতীতের কয়েকটি মহামারির কথা ভাবা যাক। ২০০২-২০০৩ সালে সার্স (SARS) মহামারি চীন, সিঙ্গাপুর, হংকং, ভিয়েতনামসহ বহু দেশকে আক্রান্ত করে। বাদুড়ের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায় বলা জানা যায়। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে কানাডায় বিশেষভাবে এ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী সাত শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। এ ভাইরাসের উৎপত্তি ঘটে চীনে। অন্যান্য মহামারির মতো সার্স মহামারিতেও দেখা যায়, মূলত দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষই বেশি আক্রান্ত হয়েছে। অন্য মহামারির মতো সার্স মহামারির সময়েও নানা সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চীন থেকে এ রোগের উৎপত্তি হওয়ার কারণে কানাডায় তখন ব্যাপক হারে শুরু হয় চীনা-কানাডিয়ানদের ব্যাপারে বিদ্বেষ। একধরনের বর্ণবৈষম্য ছড়িয়ে পড়ে। উন্নত অর্থনীতির দেশ হলেও কানাডাও এই মহামারি সামলাতে প্রাথমিকভাবে অনেকটাই ব্যর্থ হয়। এ ক্ষেত্রেও শতাব্দীপ্রাচীন কোয়ারেন্টিন পদ্ধতিই ব্যবহার করতে হয়। যে পদ্ধতিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চলাচলকে সীমিত গণ্ডির মধ্যে নির্দিষ্ট করে সংক্রমণের ঝুঁকি কমানো হয়। কিন্তু জনগণের সঙ্গে যথার্থ আলাপ-আলোচনা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি না করেই এ ধরনের নানা সরকারি বিধিনিষেধ আরোপ করাতে জন-অসন্তোষও সৃষ্টি হয়। ২০০৯-১০ সালের দিকে সোয়াইন ফ্লু নামের আরেকটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস মহামারি আকারে বিশ্বব্যাপী দেখা দেয়। মেক্সিকো ও আমেরিকায় এই রোগের সূত্রপাত ঘটে এবং পৃথিবীর নানা দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। ১২ হাজারের অধিক

লোকের মৃত্যু ঘটে এ মহামারিতে। এ ধরনের একটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ১৯১৮ সালে একবার মহামারি আকারে দেখা দিয়েছিল আমেরিকায়। অভিযোগ রয়েছে যে ২০০৯-১০ সালের সোয়াইন ফ্লু মহামারির সময় যে গবেষকেরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে এই মহামারি মোকাবিলায় পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করছিল বিশেষ কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। অভিযোগ উঠেছে যে গবেষকেরা বিশ্বব্যাপী আতঙ্ককে প্রলম্বিত করে সেই সব ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির তৈরি ভ্যাকসিন বিক্রি বাড়াতে সহায়তা করেছিলেন। লক্ষণীয় যে মহামারি নানা গোষ্ঠীর স্বার্থ উদ্ধারের উপলক্ষও হয়ে ওঠে।

২০১৪ সালে আফ্রিকায় ইবোলা নামের আরেকটি মারাত্মক মহামারি দেখা দেয়। এই ভাইরাসের উৎপত্তি বাদুড় বা বানর থেকে বলে ধারণা করা হয়। এই মহামারিতে প্রায় ১২ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয় এবং শুধু লাইবেরিয়াতেই পাঁচ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। এ মহামারির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। মহামারির ক্ষেত্রে যেমন 'ভিকটিম ব্লেমিং' হয়, এ ক্ষেত্রেও প্রাথমিকভাবে লাইবেরিয়ানদের সনাতন সৎকারের ব্যবস্থা, বন্য প্রাণী খাওয়া ইত্যাদিকেই এই মহামারির জন্য দায়ী করা হয়। কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, তথ্যের অভাব ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবই মূলত লাইবেরিয়ায় মহামারিতে এত বেশি মৃত্যুর কারণ। আফ্রিকার একটি প্রান্তিক দেশ বলেও প্রাথমিকভাবে এই মহামারির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নজর ছিল না এবং এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় জনস্বাস্থ্য গবেষণাও বিলম্বে করা হয়, ফলে এই মহামারি প্রতিরোধে সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতের ভিত্তিতে এমন সব পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা স্থানীয় স্বাস্থ্যকাঠামো ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এসব সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণেই মূলত ইবোলা মহামারি লাইবেরিয়াতে ব্যাপক অভিঘাত হানে।

২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী জিকা ভাইরাসের আরেকটি মহামারি দেখা দেয়। এ মহামারি সংক্রমিত হয় মশা থেকে। এই মহামারিও মূলত দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষকে বেশি আক্রান্ত করে। বিশেষ করে নারীদের এই ভাইরাস বেশি আক্রান্ত করে। গর্ভবতী মায়েরা এ ভাইরাসে সংক্রমিত হলে তা তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে আক্রান্ত করে এবং সন্তানের নানা জন্মগত ত্রুটি দেখা দেয়, বিশেষ করে মস্তিষ্ক গঠনে ব্যাঘাত ঘটে। এই মহামারির কারণেও মানুষের চলাচল ব্যাপকভাবে সীমিত করা হয় এবং বিশেষ করে নারীদের গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। এই মহামারির কারণে ব্রাজিলে অনুষ্ঠেয় ২০১৬ সালের সামার অলিম্পিক বিঘ্নিত হয়। এর বড় প্রভাব পড়ে ব্রাজিলের অর্থনীতিতে। ব্রাজিলের অনুন্নত

স্বাস্থ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্য বাজেটের স্বল্পতার কারণে সেখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এর অভিঘাত হয় প্রবল। জিকা ভাইরাস আমেরিকাতে ছড়ালেও সেখানে সহজলভ্য মশা রেপেলেন্ট, ভালো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি এলাকার স্বল্পতার কারণে এটি মহামারি আকার ধারণ করেনি। আবার অতিদরিদ্র ব্রাজিলীয় নারীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভপাতের সুযোগ না থাকলে বাধ্য হয়ে গর্ভবতী হতে হয় এবং সচেতন থাকার পরও বহু নারীর গর্ভস্থ সন্তান জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে জন্মগত ত্রুটি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়।

জিকা মহামারি শুরু হওয়ার ঠিক আগে বেশ কয়েকটি বড় আন্তর্জাতিক সমাবেশ হয়েছিল ব্রাজিলে, যেমন বিশ্ব যুব দিবস, বিশ্বকাপ ফুটবল ও বিশ্ব স্প্রিন্ট প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক চলাচল এবং এসব বৃহৎ সমাবেশ এই মহামারি বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হয়। তা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ব্রাজিলে সে বছর ব্যাপক বৃষ্টিপাত ও পরবর্তী সময়ে খরার কারণে মশার অভূতপূর্ব বংশবৃদ্ধি ঘটে। এটিও এ মহামারির ব্যাপকতায় ভূমিকা রাখে। জিকা ভাইরাস মহামারি রোগের সঙ্গে বিশ্বায়ন, দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, যোগাযোগ ইত্যাদি নানা শর্ত স্পষ্ট করে তোলে। অন্যদিকে এইচআইভি/এইডস মহামারিরও নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে, যা এই নিবন্ধের পরিসরে আলোচনায় অনুল্লিখিত রইল।

অতিসাম্প্রতিক

অতিসাম্প্রতিক সময়ে করোনাভাইরাসের বিশেষ একটি প্রজাতি কোভিড-১৯-এর মহামারি ব্যাপক অভিঘাত সৃষ্টি করেছে বিশ্বব্যাপী। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের চীনে এ ভাইরাসের সূত্রপাত এবং মাত্র কয়েক মাসে শতাধিক দেশে তা ছড়িয়ে পড়েছে, লাখ লাখ মানুষ এতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যে মারা গেছে। এর ব্যাপকতা বেড়ে চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে 'প্যানডেমিক' ও জরুরি মহামারি হিসেবে ঘোষণা করেছে। বহু দেশ তাদের প্রধান শহরের অধিবাসীদের চলাচল বন্ধ করে গৃহবন্দী থাকার নির্দেশ দিয়েছে, বিমানবন্দর বন্ধ করে দিয়েছে, বড় জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে। এই মহামারির স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাগত মাত্রা নিয়ে ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য মহামারির মতো করোনাভাইরাসের মহামারিরও নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রা আমরা লক্ষ করব।

এই মহামারির সূত্রপাত ঘটেছে চীনের উহানে অবস্থিত প্রাণীর বাজারে, যেখানে জীবিত ও মৃত গৃহপালিত ও বন্য প্রাণী এবং তাদের মাংস বিক্রি করা হয়। বাদুড়কে করোনাভাইরাসের উৎস হিসেবে ধারণা করা হয়। উল্লেখ্য, এর

আগের সার্স মহামারির উৎপত্তিও ঘটেছিল চীনে এবং এমন একটি প্রাণীর বাজার থেকেই। বোঝা যায়, এই প্রাণীর বাজারের ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটির কারণেই ভাইরাস প্রাণীর দেহ থেকে মানুষের দেহে চলে আসার সুযোগ পেয়েছে। বিশেষ করে করোনাভাইরাস ছড়ানোর পেছনে চীনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও একটা ভূমিকা রয়েছে। চীনের এক পার্টিকেন্দ্রিক ও কড়া নজরদারির রাজনীতির কারণে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের খবর বিশ্বের কাছে পৌঁছাতে দেরি হয়। উহান শহরের চিকিৎসক লি ওয়েনলিয়ান, যিনি প্রথম এই রোগের খবর প্রচার করেন, তাঁকে চীনা সরকারের রোষানলে পড়তে হয়। চীনা সরকার তাঁকে গুজব ছড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত করে। দুঃখজনকভাবে এই চিকিৎসক পরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েই মারা যান। চীনে খুব দ্রুত হাজার হাজার মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং অগণিত মৃত্যু ঘটে। এই মহামারির জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে চীনা সরকার ব্যাপক সমালোচিত হয়। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের নেতৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও চীনকে অপমানজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। বহু দেশ চীনের সঙ্গে যাতায়াত ও ব্যবসায়িক লেনদেন স্থগিত করাতে দেশটির অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ব্যাপক অর্থনৈতিক ধসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে চীন। তবে চীন ইতিমধ্যে মহামারির প্রাদুর্ভাবকে কমাতেও সক্ষম হয়েছে ব্যাপক আকারের নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে। বিশাল বিশাল শহরের কোটি কোটি মানুষকে গৃহবন্দী অবস্থায় রাখতে বাধ্য করতে সক্ষম হয় তারা। নানা ডিজিটাল মনিটরিংয়ের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের রোগ পর্যবেক্ষণে সক্ষম হয়, এমনকি মাত্র ১০ দিনে ১ হাজার শয্যার হাসপাতাল তৈরি করে ফেলে তারা, যা বহু পশ্চিমা উন্নত অর্থনীতির দেশের পক্ষেও দুরূহ। অনেকে মনে করেন, চীনের এককেন্দ্রিক ও কঠোর নজরদারির রাজনীতি যেমন এ রোগ বিস্তারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, আবার এ রাজনীতিই এই বিশাল সংকট মোকাবিলায় সাহায্য করেছে।

এই ভাইরাস আমেরিকার রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলছে। যদিও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ ভাইরাসকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তবে আসন্ন নির্বাচনে এই মহামারির একটা প্রভাব থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৪ সালে ইবোলা মহামারির সময় ওবামা প্রশাসন তাদের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে মহামারি মোকাবিলায় একটি ইউনিট তৈরি করে, যা ট্রাম্প এসে বাতিল ঘোষণা করেন। এমনকি আমেরিকার প্রখ্যাত সিডিসি বা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের বাজেটও ট্রাম্প অনেক কমিয়ে দেন। ফলে করোনা যদি আমেরিকায় ব্যাপকতা পায়, তাহলে তা মোকাবিলায় যথেষ্ট রসদ এবং প্রস্তুতি তাদের নেই বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এবং তেমন পরিস্থিতি হলে তা আমেরিকার আগামী

নির্বাচনে ট্রাম্পের সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকটাই কমিয়ে আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এখানে অনেকে ষড়যন্ত্রের আভাসও দেখছেন। দেখছেন গোপন জীবাণুযুদ্ধের ইঙ্গিত। তাঁরা ভাবছেন, নাহলে চীন আর ইরান—আমেরিকার প্রধান এই দুই আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীই-বা কেন প্রথম এই মহামারিতে আক্রান্ত হবে। সেসব ষড়যন্ত্রের তত্ত্বকে গুরুত্ব না দিলেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এই মহামারির নানা রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে।

এই করোনা মহামারির সূত্র ধরে দেশে দেশে চীন এবং চীনাদের প্রতি নেতিবাচক নানা মনোভাবের জন্ম হচ্ছে। চীনাদের প্রতি নানা বিদ্বেষপূর্ণ আচরণও লক্ষ করা যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় চীনাদের প্রতি নানা বিদ্বেষপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। জাপানের অনেক রেস্টুরেন্টে চীনা কাস্টমারকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ব্রিটেনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কয়েক লাখ চীনা ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। সেখানেও চীনা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নানা বর্ণবৈষম্যমূলক ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রতিক সময়ের দুটি বড় মহামারির সূত্রপাতই ঘটেছে চীন থেকে। ব্যাপারটি ভেবে দেখার। চীন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বড় অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠছে। এই অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির অনেকটুকুই এসেছে বিশ্ববাজারে সুলভ পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে। বিশ্ববাজারকে সরবরাহের জন্য চীনকে পণ্যের মাস প্রোডাকশন বা বিপুল আকারের উৎপাদনে যেতে হয়। অল্প সময়ে বিপুল উৎপাদন করতে গিয়ে প্রাকৃতিক এবং জনজীবনে কী প্রভাব পড়ছে, সেটি চীনের পক্ষে সব সময় নজর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রভাবে চীন ও বাকি বিশ্ব পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এ ধরনের মহামারি পণ্য উৎপাদন, বিশ্বায়নের কারণে মানুষ এবং পণ্যের চলাচল ইত্যাদি নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ রয়েছে।

পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে করোনা মহামারি এখনো ব্যাপক আকার ধারণ করেনি, কিন্তু করলে তা সামাল দেওয়া দুরূহ হবে। কারণ, স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও রসদের অভাব। বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে এই মহামারি। মহামারি যে অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক, অসহায়ত্বের জন্ম দেয়, তাতে সুযোগ তৈরি হয় গুজব রটনাকারীদের, মুনাফালোভীদের। কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে সতর্ক নজর রেখে স্থির মস্তিষ্কে স্থানীয় পরিস্থিতি মোকাবিলা করাই এখন জরুরি। এই ভাইরাসের সঠিক গতিবিধি এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও দেখা যাচ্ছে, এ মহামারি মোকাবিলা সবচেয়ে সহজ-সুলভ উপায় আপাতত সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা আর ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কিছু নিয়ম মেনে চলা। জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে। রাষ্ট্রের প্রয়োজন জনগণের কাছে পরিস্থিতির ব্যাপারে স্বচ্ছ থেকে, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা

করা। সমান্তরালে প্রত্যেকের জন্য জরুরি হবে মহামারিতে নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। এ শুধু নিজের স্বার্থে নয়, অন্যের স্বার্থেও।

করোনাভাইরাসের এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে দূর, নিকট ও সাম্প্রতিক মহামারিগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছু চুম্বক পর্যবেক্ষণের কথা বলা যেতে পারে :

— মহামারি একটি রোগ এবং স্বাস্থ্যগত ব্যাপার হলেও এর নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক মাত্রা রয়েছে।

— মহামারিতে বরাবরই প্রান্তিক মানুষই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় এবং মহামারি সমাজের অভ্যন্তরের সুপ্ত বিদ্বেষ ও অসন্তোষকে প্রকাশ্য করে তোলে।

— মানুষের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা জীবাণুকে সুযোগ করে দেয় মহামারির আকার নিতে।

— মহামারি যে আতঙ্ক ও অনিশ্চিয়তার জন্ম দেয়, তাতে সুযোগসন্ধানীরা নানা স্বার্থ হাসিলের পাঁয়তারায় থাকে।

— মহামারি আমাদের ফিরে দেখতে উদ্বুদ্ধ করে আদি-অকৃত্রিম প্রকৃতির দিকে, স্মরণ করিয়ে দেয় প্রকৃতির কাছে মানুষ কতটা অসহায়, ভাবতে বাধ্য করে বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির সঙ্গে প্রকৃতির দাবি সাংঘর্ষিক হয়ে উঠছে কি না।

— মহামারি আমাদের জানায়, আমরা ব্যক্তি হলেও আমাদের অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে সামষ্টিক স্বার্থের সঙ্গে। একটি সংকট যখন সর্বমানবিক হয়ে ওঠে, তখন তার সমাধানও আসতে হবে সর্বমানবিক যৌথ চেষ্টাতেই।

তথ্যসূত্র

Arnold, D. (1993) *Colonizing the Body : State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India*, University of California Press

Evans, RJ (1988) "Epidemics and Revolutions : Cholera in Nineteenth-Century Europe", *Past & Present*, No. 120

Kapiriri, L. & Ross, A. (2018) The Politics of Disease Epidemics : a Comparative Analysis of the SARS, Zika, and Ebola Outbreaks, *Global Social Welfare* volume 7, pages33-45

McNeill, WH (1976) *Plagues and Peoples*, Anchor, New York City

Ong, JC and Lasco, G. (2020) The epidemic of racism in news coverage of the coronavirus and the public response, London School of Economics

LSE blog , https ://blogs.lse.ac.uk/medialse/2020/02/04/the-epidemic-of-racism-in-news-coverage-of-the-coronavirus-and-the-public-response/

Rachman. G. (2020) Coronavirus : how the outbreak is changing global politics, *Financial Times*, https ://www.ft.com/content/fd8bfd8a-5a25-11ea-abe5-8e03987b7b20

World Health Organization WHO (2020) Coronavirus disease (COVID-19) outbreak, https ://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেট ও তাদের সহিংসতা জায়েজ করার বয়ান

সাইমুম পারভেজ

সারসংক্ষেপ

ইসলামিক স্টেট (আইএস) তাদের কৌশল ও কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন করছে। গুরুতর সাংগঠনিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনেই তারা এই পরিবর্তন করছে। আইএস কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে তাদের স্থানীয় দোসরদের সহযোগিতায় স্থানীয় অসন্তোষকে ব্যবহার করে তাদের মতাদর্শ সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। আইএসের সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া অগ্রাধিকার তালিকায়। কিন্তু আইএসের ওপর যেসব লেখাজোকা রয়েছে, তাতে এই অঞ্চলের জিহাদিদের ভূমিকা কী হবে, বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, সে বিষয়টি অস্পষ্ট। জ্ঞানগত এই অসম্পূর্ণতা পূরণের লক্ষ্যে এই গবেষণা নিবন্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইএস-সংশ্লিষ্ট সহিংস উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর গড়ন, উৎস, নেতৃত্ব, লক্ষ্যবস্তু, উদ্দেশ্য ও আন্তর্জাতিক সংযোগ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। এ ছাড়া কীভাবে বাংলাদেশি প্রবাসী জঙ্গিরা আইএসে যুক্ত হয় এবং যেসব মুখ্য ব্যক্তি বাংলাদেশের আইএস সংযোগের পেছনে কাজ করে, সে সম্পর্কে এই নিবন্ধে ব্যাখ্যা করা হবে। এই গবেষণা নিবন্ধে দেখানো হবে যে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতি অস্বীকার করলেও আইএসের দাবি করা হামলাগুলো প্রমাণ করে যে দীর্ঘ মেয়াদে তাদের এই অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি এই গবেষণা নিবন্ধে আইএসের মুখপত্র সাময়িকী *দাবিখ*, *রুমাইয়া* এবং তাদের ভিডিও, টেলিগ্রাম চ্যানেলসহ অন্যান্য জিহাদি বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের পাশাপাশি বাংলাদেশে তাদের ব্যবহৃত সহিংসতার বয়ানের বিশ্লেষণ করা হবে। এই গবেষণা নিবন্ধে জিহাদের বাংলাদেশি ভাষ্যের মূলত তিনটি মূলভাব চিহ্নিত করা হয়েছে : সংকট বিনির্মাণ, সমাধান বিনির্মাণ এবং বর্তমান সংকটের একমাত্র সমাধানের পথ হিসেবে জিহাদের যৌক্তিকতা তুলে ধরা।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

ইসলামিক স্টেট, বাংলাদেশ, জিহাদি বয়ান, প্রবাসী জঙ্গি, দক্ষিণ এশিয়া।

ভূমিকা

২০১৬ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেটের দোসররা জিম্মি সংকটের ঘটনা ঘটায়। ঢাকার ধনাঢ্য এলাকায় অবস্থিত বিদেশিদের কাছে জননন্দিত রেস্টুরেন্ট হোলি আর্টিজান বেকারিতে সহিংস উগ্রবাদীরা এক ঝটিকা হামলা চালায়। তারা ভারত, ইতালি, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকসহ ২০ জন জিম্মিকে কুপিয়ে এবং জবাই করে হত্যা করে। জিহাদিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর বন্দুকযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১২ ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধকর জিম্মি পরিস্থিতির অবসান ঘটে। দুজন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা এবং পাঁচজন হামলাকারী এই ঘটনায় নিহত হয়। যদিও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছোট পরিসরে এবং উদ্দিষ্ট একাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে এই ভয়াবহ হামলা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত জিহাদিরা ন্যূনতম ৪০ জন লেখক, প্রকাশক, অ্যাকটিভিস্ট-মুক্তমনা, বিদেশি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যকে হত্যা করেছে। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সময়কালে ৫০টি সহিংস উগ্রবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে, যাতে ২৫৫ জন নিহত এবং ৯৪২ জন আহত হয়েছে।[১]

সিরিয়া ও ইরাকে ইসলামিক স্টেট পতনের মুখে। বাংলাদেশেও ইসলামিক স্টেট-সংশ্লিষ্ট সহিংস-উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর শীর্ষ নেতাদের মৃত্যু বা গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটছে। ফলে এ দেশে তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা হ্রাসের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। গুরুতর সাংগঠনিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনে সন্ত্রাসী সংগঠনটি কৌশল ও কার্যপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনছে।[২] তাদের স্থানীয় ও আঞ্চলিক হামলাগুলো সামগ্রিক আকারে বৈশ্বিকভাবে সমন্বিত নয়। এর বদলে স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতিতে যেসব অসন্তোষ আছে, নিজস্ব কার্যসিদ্ধির জন্য তারা সেগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।[৩] ২০১৯ সালের মে মাসে ভারতীয় অঞ্চলকে আইএস প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ওপর আইএসের এই ব্যাপৃত বিকেন্দ্রীকরণমুখিতার যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, তা এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায়।[৪] সংগঠনটির নেতা আবু বকর আল-বাগদাদি সিরিয়াতে পরাজয় স্বীকার করেন (২০১৯ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত ভিডিও বার্তার মাধ্যমে), কিন্তু তিনি তাঁর অনুসারীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে ক্রুসেডাররা এবং তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ইসলাম ও তার অনুসারীদের[৫] শুধু ইরাক এবং সিরিয়াতে নয়, বরং আইএস দ্বারা অনুপ্রাণিতরা এবং দোসররা দূরদূরান্তে যে যেখানেই অবস্থান করছে, সেখানেও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। বস্তুত, তিনি সিরিয়ার আইএসের সর্বশেষ শক্ত ঘাঁটি বাগুজে সংগঠনের পরাজয়ের 'প্রতিশোধ' হিসেবে শ্রীলঙ্কায় সমন্বিত সিরিজ বোমা হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেন। এই হামলায় ন্যূনতম ২৫০ জন নিহত হয়।

সাম্প্রতিককালে আইএসের সাংগঠনিক পুনর্গঠনের লক্ষণ এবং পরিধি সম্প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা দেখলে এই অঞ্চলে অনেকগুলো কারণে বহুমাত্রিক সহিংস উগ্রবাদের উত্থান হচ্ছে বলে ধারণা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, গত দুই বছর কার্যত নিষ্ক্রিয়তার পর[৬] বাংলাদেশের আইএস উগ্রবাদীরা নিজেদের পুনরায় সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।[৭] এর প্রমাণ মেলে ইস্টার সানডেতে শ্রীলঙ্কায় বোমা হামলা[৮] এবং ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলাগুলোর দায় স্বীকার থেকে।[৯] পরবর্তীকালে তা আবার আইএস-বান্ধব টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রচারিত 'অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে হামলার হুমকি' শীর্ষক বার্তা প্রদানও করা হয়। উল্লেখিত উদ্বেগজনক ইঙ্গিতগুলো সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণ গবেষণার অভাব থাকায় গবেষকদের জন্য বাংলাদেশে আইএসের বিকাশ এবং সিরিয়াতে বাংলাদেশি প্রবাসী জঙ্গিদের ভূমিকা বিশ্লেষণ জটিল হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া স্থানীয় জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি, উগ্রবাদের প্রতি ব্যাপক সমর্থনের দাবি[১০] এবং আন্তরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সংযোগের প্রমাণ সত্ত্বেও বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেট (আইএস) এবং তৎসংশ্লিষ্ট সহিংস উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা বিষয়ে গবেষণা প্রায় অনুপস্থিত।[১১] দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলো যে মাত্রায় সহিংস উগ্রবাদ বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, সে তুলনায় বাংলাদেশ খুব একটা সক্ষম হয়নি।[১২] এই অসম্পূর্ণতা পূরণের লক্ষ্যে এই গবেষণায় বাংলাদেশে আইএস জিহাদিদের শিকড় এবং বিবর্তন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তাদের আন্দোলনের প্রভাব, কৌশল এবং মতাদর্শ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হবে। একই সঙ্গে এই গবেষণায় কীভাবে আইএস জিহাদিদের সৃষ্ট বিষয়বস্তুগুলো বাংলাদেশে সহিংস জিহাদের সপক্ষে যৌক্তিকতার বয়ান তৈরি করে, তা অনুসন্ধান করা হবে।

সহিংস উগ্রবাদী সংগঠন এবং তাদের বয়ান

বয়ান হচ্ছে মূলত বর্ণনামূলক ঘটনা, যার সংযুক্ত উপাদান এবং পর্যায়ক্রমিকতা মিলে বিশ্বের কাছে সুনির্দিষ্ট একটা অর্থ এবং ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে।[১৩] এটি বর্ণনামূলক ঘটনাপঞ্জির একটি পদ্ধতিবিশেষ, যার মাধ্যমে মূল ভাব, রূপ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ধরনগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।[১৪] বহু গবেষণায় সহিংস উগ্রবাদীদের বয়ান বিশ্লেষণ করা হয়েছে[১৫]; এর মধ্যে কিছু গবেষণায় এই গোষ্ঠীগুলোর চিন্তা ও আচরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য ইসলামপন্থীদের ছড়িয়ে দেওয়া অপপ্রচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১৬] এক গবেষণায় সহিংস উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর বক্তব্যের মধ্যে ইসলামপন্থীদের মুখ্য বয়ান বহিঃপ্রকাশ এবং কীভাবে বয়ানগুলো শুধু সরল ব্যাখ্যা ও কেবল অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ঘটনাপঞ্জিকে

সংযুক্ত করা নয়, বরং ধর্মীয় গ্রন্থমালা থেকে আহরিত ভাবনা, পাঠ্য ও ব্যাখ্যাকে যুক্ত করে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৭] সামান্থা মাহুদ ও হালিম রানা তাঁদের গবেষণায় আইএসের অনলাইন ম্যাগাজিন *দাবিখ*-এর ১০টি সংখ্যায় প্রকাশিত সংগঠনটির বয়ানগুলো বিশ্লেষণ করেছেন এবং ক্রুসেড/ক্রুসেডারদের (৪৫২ বার), জাহিলিয়া (২৭ বার), মুনাফিক (বিশ্বাসঘাতক; ২৩ বার) ও বদরের যুদ্ধের (২১ বার) সরাসরি উদ্ধৃতি পেয়েছেন।[১৮] অন্য এক গবেষণায় চার্লি উইন্টার ২০১৫ সালের ১৭ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ইসলামিক স্টেটের ১ হাজার ১৪৬টি অপপ্রচারের ঘটনা সংকলিত করেন এবং প্রধান ছয় ধরনের বয়ান চিহ্নিত করেন : নৃশংসতা (২.১৩%), ক্ষমা (০.৪৫%), একাত্মতা (০.৮৯%), নির্যাতিত (৬.৮৪%), যুদ্ধ (৩৭.১২%) এবং বেহেশত (অনন্ত শান্তির উদ্যান; ৫২.৫৭%)।[১৯] তা ছাড়া ডেভিড গার্টেন-রোস, নাথানইয়েল বার ও ব্রিডগেট মরং তাঁদের গবেষণায় ইসলামিক স্টেটে যোগদানে আগ্রহী/সম্ভাব্য/প্রার্থী উগ্রবাদীদের নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়োগ করা বয়ানগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।[২০] জি এম বার্জার, মোহাম্মদ হাফিজ[২১] ও হারেরো ইনগ্রাম[২২] তাঁদের গবেষণায় উগ্রবাদী দলগুলোর তাদের বয়ান নির্মাণে ব্যবহৃত যুক্তিগুলো চিহ্নিত করেছেন। হাফিজ তাঁর গবেষণায় তিনটি মূল ভাব বর্ণনা করেছেন। প্রথম মূল ভাবটি সংকট উপস্থাপন করে—'ইসলাম হুমকির সম্মুখীন; বিশ্বের সর্বত্র পশ্চিমা দখলদারদের/ক্রুসেডারদের হাতে মুসলিমরা নিগৃহীত ও নিপীড়িত হচ্ছে।'[২৩] দ্বিতীয় মূল ভাবে মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে কিছু করার সীমাবদ্ধতা ও অনীহা তুলে ধরা হয়েছে। এই মূল ভাবে দাবি করা হয় যে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীগুলো পশ্চিমা প্রভুদের পুতুল বা তাঁবেদার। তৃতীয় এবং সর্বশেষ মূল ভাবটিতে মুসলিম পরিত্রাতারা তাঁদের (কল্পিত) শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবেন এবং তাঁদের (স্বতন্ত্র) ইসলামি ব্যাখ্যানুসারে সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করবেন—এই আশাবাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ইনগ্রাম দাবি করেন যে উগ্রবাদীরা তাদের বার্তাগুলো তৈরি করে মূলত সৃজিত সংকট ও সমাধানের ভিত্তিতে, আন্তদল এবং বহিঃ দলে বিভিন্ন পরিচয়, নিজেদের 'সুন্নি মুসলিমদের পরিত্রাতা ও রক্ষক (সামান্তরিকভাবে)' বলে আখ্যায়িত করে এবং কেন মুসলিম সম্প্রদায়ের 'আমাদেরকে এবং আমাদের সমাধানকে সমর্থন (যেমন আন্তদলীয় রাজনৈতিক-সামরিক কর্মসূচি)' করা উচিত, তার সপক্ষে মতাদর্শিক যুক্তি হিসেবে এই অনুমিত ধারণা ব্যবহার করে।[২৪]

বার্জারের বিশ্লেষণে দেখা যায়, উগ্রবাদীরা ষড়যন্ত্র, কলুষতা, অস্তিত্বের প্রতি হুমকি, অনাচার-অবিচার, দুর্যোগ ও কর্তৃত্ববাদের মতো একই ধরনের বহু বয়ান ব্যবহার করে। তিনি যুক্তি দেন, সহিংস-উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলো শুধু সংকট-সমাধানকাঠামোর মাধ্যমে সংঘাত নিরসনে চেষ্টা করে। তা ছাড়া অ্যালেক্স স্মিড আল

কায়েদার ভাষ্যের তিনটি কাঠামোগত উপাদান উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে বহু মুসলিমের ক্ষোভ (যেমন বৈষম্য, অপমান, অরাজকতা, শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি ইত্যাদি), একটি উন্নততর রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বপ্ন (খিলাফত এবং শরিয়াহ আইন) এবং ক্ষোভগুলো প্রশমন ও সহিংস জিহাদের মাধ্যমে স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন করা অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

উল্লেখিত তত্ত্বগুলোর পরম্পরায় দেখা যায়, জিহাদিরা এবং বিশেষত যারা আইএসের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তারা বাংলাদেশে তাদের সহিংস হামলার পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরে। এই যৌক্তিকতার বয়ানে সংকট চিহ্নিত করা হয়, সমাধানের পথ দেখানো হয় এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে সহিংস সশস্ত্র জিহাদই এই সংকট সমাধানের একমাত্র পথ। বাংলাদেশি জিহাদিরা বৈশ্বিক জিহাদিদের বয়ান অনুসরণ করে। স্থানীয় প্রেক্ষাপটের আলোকে সেই বার্তাগুলো আলাদা করার পর নির্মিত 'সংকট-যৌক্তিকতা-সমাধান' বয়ান ব্যবহার করে উৎসাহী ব্যক্তিদের উগ্রবাদে সম্পৃক্ত করে। সংকট ও সমাধানের পাশাপাশি, জিহাদি ভাষ্যে তাদের সহিংস আচরণের সপক্ষে যে যৌক্তিকতা তারা উপস্থাপন করে, আমি তার অন্তঃরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করব।

উপাত্ত এবং গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় প্রধানত দুটি সূত্র থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমত, আমি বাংলাভাষীদের লক্ষ্য করে প্রকাশিত ইসলামিক স্টেটের অনলাইন সাময়িকী, ভিডিও, ছকবদ্ধ তথ্যচিত্রগুলোসহ (ইনফোগ্রাফিক) জিহাদিদের বিভিন্ন নথিপত্র সংগ্রহ করেছি। *দাবিখ*-এর দুটি সংখ্যায় (১২ ও ১৪) এবং *রুমাইয়ার* একটি সংখ্যায় (২) বাংলাদেশ বিষয়ে একাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শুধুই সন্ত্রাস নামে *দাবিখ*-এর ১২তম সংখ্যায় পাঁচ পাতার 'খিলাফতের আলোর বিচ্ছুরণে বাংলায় জিহাদের পুনর্জাগরণ' শিরোনামে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাতেই ইসলামিক স্টেটের উগ্রবাদীদের বাংলাদেশে সাম্প্রতিক চারটি হামলাসহ বিশ্বব্যাপী পরিচালিত উল্লেখযোগ্য হামলাগুলোর বিবরণ প্রকাশ করা হয়।

এমনকি *দাবিখ*-এর ১৪তম সংখ্যায় বাংলাদেশকে ফলাও করা হয়; আবু ইব্রাহিম আল হানিফ নামধারী 'বাংলার খেলাফতের সৈনিকদের' (আইএস বাংলা) আমিরের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া অনলাইন সাময়িকীতে সিরিয়ায় যুদ্ধে নিহত তরুণ বাংলাদেশি আবু জান্দাল আল-বাঙালির কাহিনি প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যায় সংকলিত বাংলাদেশে সংঘটিত হামলাগুলো থেকে হিন্দু এবং শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর পরিচালিত তিনটি হামলার বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। *রুমাইয়ার* দ্বিতীয় সংখ্যায় নানা ছকবদ্ধ তথ্যচিত্রের সহায়তায় তৈরি হিজরি ১৪৩৬-৩৭ (খ্রি. ২০১৫-১৬)

সময়কালে বাংলাদেশে পরিচালিত আক্রমণগুলোর তালিকা তথ্যচিত্র আকারে প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যায় আইএস বাংলার সামরিক ও গুপ্ত কার্যক্রমের প্রধান আবু দুজানাহ আল বাঙালি নামধারী তামিম চৌধুরীর গুলশান হামলার সুহিদা শিরোনামের হোলি আর্টিজান বেকারির হামলার পাঁচ হামলাকারী নিয়ে 'এক্সক্লুসিভ' কাহিনি প্রকাশ করে। দুটি আইএস ভিডিও প্রকাশ করা হয়, যার একটিতে সিরিয়ার রাকা থেকে তিনজন বাংলাদেশি প্রবাসী জঙ্গি/মুজাহিদীন হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলাকারীদের প্রশংসা করেছে এবং বাংলাদেশে জিহাদের পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে। অন্য ভিডিওটি হোলি আর্টিজানে হামলার পাঁচ হামলাকারীকে নিয়ে বিলাদ-আল-বেঙ্গল মিডিয়া অফিস কর্তৃক নির্মিত। ধারণা করা হয়, এই ভিডিও হামলার আগে কোনো গোপন স্থানে ধারণ করা হয়েছে।[২৬] দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশি জিহাদিদের ওপর বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদনগুলো 'ইসলামিক স্টেট/আইএস/বাংলাদেশে আইএসআইএল', 'সিরিয়ায় বাংলাদেশি প্রবাসী জঙ্গিরা/মুজাহিদীনরা' এবং 'নব্য জেএমবি' মুখ্য শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে গুগলে অনুসন্ধানের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলো মূলত *দ্য ডেইলি স্টার*, *প্রথম আলো* ও *ঢাকা ট্রিবিউন* থেকে সংগৃহীত। *দ্য ডেইলি স্টার* এবং দৈনিক *প্রথম আলো* যথাক্রমে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত ইংরেজি এবং বাংলা পত্রিকা। বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের ওপর নিয়মিত বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে *ঢাকা ট্রিবিউন* নির্বাচন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলো, যেমন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি), *দ্য গার্ডিয়ান* এবং *দ্য ডিপ্লোম্যাট*-এর প্রতিবেদনগুলোও ব্যবহার করা হয়েছে। আমি সংগৃহীত উপাত্তগুলো বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সন্ত্রাসী সংগঠনটির গড়ন, নেতৃত্ব ও লক্ষ্য নিরীক্ষণ, তাদের আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং তাদের বয়ান ও বক্তব্য অনুসন্ধান করেছি।

ইসলামিক স্টেট এবং বাংলাদেশে এর দোসর গোষ্ঠী

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কটির একাধিক হামলার দাবি সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার আশ্চর্যজনকভাবে বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতি অস্বীকার করে আসছে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা ২০১৫ সালের শুরুতে সিরিয়ায় যেতে চেষ্টা করা ব্যক্তিদের পাশাপাশি আইএসের সঙ্গে সংযুক্ত 'সমন্বয়ক' ও 'দলভুক্তকারী'-কে গ্রেপ্তার করেছে বলে দাবি করেছিল। ২০১৫ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে দেশে আইএসের মতাদর্শ প্রচার করছে এবং সিরিয়ায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সন্দেহে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[২৭] ২০১৬ সালের জুলাইয়ে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার পর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নীতিপ্রণেতারা দেশে ইসলামিক স্টেটের উপস্থিতি অস্বীকার করা শুরু করেন। ইসলামিক স্টেটের পরিবর্তে

সরকারি কর্মকর্তারা সংগঠনটির নতুন নাম দেন 'নব্য জেএমবি'। তাঁরা এটাকে স্থানীয় সহিংস উগ্রবাদী সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) নতুন উপদল বলে দাবি করেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, সরকার সন্ত্রাস দমনের নামে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে এই অস্বীকৃতির কৌশল গ্রহণ করতে পারে।[২৮] সরকারের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিরা হয়তো কৌশল হিসেবে শুধু বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতি অস্বীকার করছেন না, বরং রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রধান বিরোধী দলকে এই হামলাগুলোর জন্য দায়ী করছেন এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে তারা এই ষড়যন্ত্র করছে বলে দোষারোপ করছেন।[২৯] বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।[৩০]

বাংলাদেশ সরকার এ দেশে আইএসের উপস্থিতি অস্বীকার করার বিষয়ে আইএস কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে? *দাবিখ*-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে (১২তম সংখ্যা) সংগঠনটি তাদের বিস্ময় প্রকাশ করেছে। তারা প্রশ্ন তোলে, ইতিপূর্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আইএস উগ্রবাদী এবং 'শীর্ষ আইএস সমন্বয়কদের' গ্রেপ্তারের দাবি সত্ত্বেও কী করে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতি অস্বীকার করে?[৩১] আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা প্রতিটি হামলার পর 'বাংলদেশে কোনো আইএস নেই'—এই 'অসত্য' ভাঙা রেকর্ডের মতো বাজিয়ে যাচ্ছে বলে নিবন্ধটিতে দাবি করা হয়।[৩২] বাংলাদেশ সরকারের অস্বীকৃতির প্রতিক্রিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে আইএস সরকারের অবস্থানকে 'লজ্জাজনক' এবং 'শিশুসুলভ' আখ্যায়িত করেছে। নিবন্ধে বলা হয়: 'আল্লাহর ইচ্ছায় মুরতাদ বাঙালি সরকার শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে নির্লজ্জভাবে বাস্তবতা অস্বীকার করা এবং শিশুসুলভভাবে মুরতাদ বিরোধী দলকে দোষারোপের খেলা তাদের কোনো উপকারে আসবে না, কারণ, ইসলামিক স্টেট নিশ্চয়ই এখানে থাকবে,...মুরতাদীনরা অবজ্ঞা করলেও সুদূর তিউনিসিয়া থেকে বাংলা পর্যন্ত এটি বিস্তৃত রয়েছে।...'[৩৩] বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর বর্তমান সরকারি অবস্থানের বিপরীতে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলাকারীদের মতো যারা বিভিন্ন হামলায় অংশ নিয়েছে, তারা নিজেদের আইএসের উগ্রবাদী বলে দাবি করে আসছে। প্রত্যাবর্তিত এবং গ্রেপ্তার জিহাদিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আইএসের সঙ্গে বাংলাদেশি দলভুক্তকারীদের সুস্পষ্ট সংযোগের ইঙ্গিত বহন করে।[৩৪] সংগঠনটির অন্যতম সাময়িকী *দাবিখ* বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং বাংলাদেশে জিহাদি হামলাগুলোতে তাদের সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করে একাধিক ঘটনা প্রকাশ করেছে।[৩৫]

যেখানে সরকার বাংলাদেশে আইএসের উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছে, তার বিপরীতে আইএস এ দেশে তাদের শক্ত ঘাঁটি আছে বলে দাবি করছে। এই

বৈপরীত্যমূলক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে এই সংগঠনের উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্কতামূলক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এ দেশে আইএসের প্রভাব অস্বীকার কিংবা অতিরঞ্জন—দুই-ই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।[৩৬] আইএস-সম্পর্কিত নথিপত্রগুলো বিশ্লেষণ করে আইএসের এই দাবি লক্ষ করলে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে তাদের গুপ্ত শাখাগুলো সক্রিয় রয়েছে। আমাক সংস্থার নিজস্ব টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে প্রাপ্ত ছকবদ্ধ তথ্যচিত্রে দেখানো হয়েছে, ১৯টি দেশে আইএসের তিন ধরনের উপস্থিতি বা কার্যক্রম রয়েছে। '২০১৪ সালের ২৯ জুন খিলাফত ঘোষণার পরবর্তী দুই বছর: ২০১৬ সালের ২৯ জুন পর্যন্ত আইএসের বিস্তৃতি' শিরোনামে প্রকাশিত ছকবদ্ধ তথ্যচিত্রে তিন স্তরের অবস্থানের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে: ক. প্রধান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো: ইরাক ও সিরিয়া; খ. মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো: চেচনিয়া, ইয়েমেন, মিসর, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, ফিলিপাইন, নাইজার, আফগানিস্তান ও দাগেস্তান;[৩৭] এবং গ. গুপ্ত শাখা সক্রিয় অঞ্চলগুলো: সৌদি আরব, তুরস্ক, আলজেরিয়া, ফ্রান্স, তিউনিসিয়া, লেবানন ও বাংলাদেশ। যদিও ছকবদ্ধ তথ্যচিত্রে প্রকাশিত সময় পরিক্রমার পর আইএস-সংশ্লিষ্ট উগ্রবাদীরা বাংলাদেশে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলাসহ গুরুতর হামলাগুলো চালিয়েছে। অতএব, এই হামলাগুলোর পর বাংলাদেশে আইএসের প্রভাবের মাত্রার কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়, যদিও আইএসের বেশ কিছু প্রকাশনায় এখনো বাংলাদেশকে উইলিয়াত (প্রদেশ) নয়, বরং বিলাদ (ভূখণ্ড বা অঞ্চল) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৩৮]

কেন্দ্রীয় আইএসের সঙ্গে বাংলাদেশে সংগঠনটির দোসর গোষ্ঠীগুলোর সংযোগ উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক প্রতীয়মান হয়েছে। বৈশ্বিক জিহাদি সংগঠনের সঙ্গে স্থানীয় গোষ্ঠীগুলো সংযোগ গড়ার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক জিহাদের অংশীদার হিসেবে নিজেদের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। অনুরূপভাবে, জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) এই উপদল সাময়িক নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে উঠে পুনরুত্থান এবং পুনর্গঠনে নতুন এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততার সদ্ব্যবহার করে।[৩৯] অন্যদিকে আইএসের বৈশ্বিক জিহাদ বিস্তারের উচ্চাভিলাষের পাশাপাশি স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আঁতাত দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন ঘাঁটি গড়ে তুলতে স্থানীয় অসন্তোষগুলোকে ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে। তা ছাড়া আইএসের দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলার উচ্চাভিলাষের কারণে তাদের প্রতিপক্ষ আল-কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের (একিউআইএস) চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।[৪০] আনসার আল ইসলাম বাংলাদেশ নামে স্থানীয় জিহাদি গোষ্ঠী ইতিমধ্যে একিউআইএসের সঙ্গে শক্তিশালী বন্ধন স্থাপন করেছে এবং ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে আল-কায়েদা প্রধান আয়মান আল জাওয়াহারি দক্ষিণ এশিয়ায় শাখা

প্রতিষ্ঠার ঘোষণার পর উপর্যুপরি অনেকগুলো হামলা চালিয়েছে। ঘটনাপরম্পরায় এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় আইএসকে বাংলাদেশের আগ্রহী সহিংস উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং বন্ধন সুদৃঢ়করণের অজুহাত জোগায়।

দুটি সন্ত্রাসী সংগঠনের সমন্বয়ে বাংলাদেশে আইএস-সংশ্লিষ্ট সহিংস উগ্রবাদী গোষ্ঠীটি গঠিত হয়েছে; একটি হচ্ছে জেএমবি (সারোয়ার জাহানের নেতৃত্বাধীন) এবং অপরটি হচ্ছে কানাডীয় বাংলাদেশি তামিম চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত জান্দ-আত-তাওহিদ ওয়াল-খালিফ। যৌথভাবে সংগঠন দুটি দাওয়াতুল ইসলাম বেঙ্গল নামে নতুন সংগঠন গড়ে তোলে এবং ইসলামিক স্টেটের অনুগত থাকার অঙ্গীকার করে।[৪১] তামিমের কানাডীয় বৈশ্বিক যোদ্ধাদের বা মুজাহিদদের সঙ্গে, বিশেষত 'ক্যালগারি ক্লাস্টার'-এর (দক্ষিণ কানাডীয় গোষ্ঠী) সঙ্গে সম্পৃক্ততার আলামত পাওয়া গেছে এবং বাংলাদেশে আসার আগে তিনি সিরিয়ায়ও সফর করেছেন বলে জানা গেছে। আইএসের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ নির্দেশে বাংলাদেশে আসার আগে তিনি সিরিয়াতে আবু-দুজানাহ আল-বাঙালি নাম নেন এবং সামরিক ও গুপ্ত কার্যক্রমের প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। আইএসের বেশ কিছু প্রকাশনা অনুসারে আবু-ইব্রাহিম আল-হানিফ নামের ব্যক্তিকে বাংলাদেশে আইএসের আমির হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। যদিও আবু ইব্রাহিম আল-হানিফের প্রকৃত পরিচয় এখনো জানা যায়নি। কতিপয় পর্যবেক্ষক একটি জাপানিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাইফুল্লাহ ওজাকি আইএসের বাংলাদেশ পর্বের আমির ছিলেন এবং সারোয়ার জাহান (ওরফে আসিম আজওয়াদ) বাংলাদেশে ওজাকির প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে দাবি করেন।[৪২] স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দাবি করে, তামিম চৌধুরী[৪৩] অথবা সারোয়ার জাহান[৪৪] হচ্ছেন আবু ইব্রাহিম আল-হানিফ। অবশ্য বাংলাদেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দাবি, আবু ইব্রাহিম নামে পরিচিত বাংলাদেশে সক্রিয় সহিংস উগ্রবাদী নেতার নামকরণের পেছনে অন্য কারণ থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে হামলাকারী গোষ্ঠী স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট বলে সরকারি দাবি অনুসরণ করার অংশ এই নামকরণ।

ইসলামিক স্টেটের অনলাইন সাময়িকী *দাবিখ*-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে ইরাক ও সিরিয়াতে আইএসের 'খিলাফত' ঘোষণা-পরবর্তী সংগঠনটির ফলপ্রসূ প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে সংগঠনে যুক্ত হতে বাংলাদেশি জিহাদিরা সম্মিলিত হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে।[৪৫] 'খিলাফত' ঘোষণার আগে বাংলাদেশে জিহাদিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকলেও সফল অনলাইন প্রচারণার বদৌলতে বিভিন্ন সহিংস উগ্রবাদী সংগঠনের বিচ্ছিন্ন উপদলগুলোকে একীভূত করা সম্ভব হয়েছে বলে আইএসের তরফ থেকে দাবি করা হয়। নিবন্ধে উল্লেখিত '...বাংলার খিলাফতের যোদ্ধারা খলিফা ইব্রাহিমের

প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছে, তারা একীভূত হয়েছে, তারা একজন আঞ্চলিক নেতা নির্বাচন করেছে, যার নেতৃত্বে তারা সম্মিলিত হয়েছে, তারা তাদের পূর্বতন উপদল বিলুপ্ত করেছে, প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এবং তারা অনতিবিলম্বে ক্রুসেডারদের এবং তাদের দোসররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের আক্রমণ করার ব্যাপারে ইসলামিক স্টেটের নির্দেশ প্রতিপালন করবে।"[৪৬] বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেটের কার্যক্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: প্রথমত, সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি প্রবাসী জঙ্গিরা; এবং দ্বিতীয়ত, ইসলামিক স্টেটের দোসর গোষ্ঠী দাওয়াতুল ইসলাম বেঙ্গলের উগ্রবাদীরা, যারা 'খিলাফতের' প্রতি তাদের আনুগত্যের ঘোষণা দিয়েছে এবং ইসলামিক স্টেটের পক্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকাশিত প্রাতিষ্ঠানিক সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব এবং বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেটের উপস্থিতির বিষয়টি সরকার অস্বীকার করার কারণে আইএসের পক্ষে ইরাক ও সিরিয়াতে যুদ্ধে যোগদানকারী প্রকৃত বাংলাদেশি প্রবাসী জঙ্গিদের/মুজাহিদীনদের সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন।[৪৭] এক সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে, আইএসের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য ন্যূনতম ৫০ জন ইরাক ও সিরিয়াতে পাড়ি জমিয়েছেন; যদিও সন্ত্রাস দমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সংখ্যাটি ২০-এর বেশি নয় বলে মনে করেন।[৪৮] জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন অনুসারে এই সংখ্যা ৪০।[৪৯] অপর এক সংবাদ প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, নারীসহ প্রায় ১০০ সহিংস উগ্রবাদী আইএসে যোগদান করতে বাংলাদেশ থেকে সিরিয়ায় গিয়েছে।[৫০]

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিন বিদেশি নাগরিক—জাপানের সাইফুল্লাহ ওজাকি, অস্ট্রেলিয়ার এ টি এম তাজউদ্দিন এবং যুক্তরাজ্যের সাইফুল হক সুজন বাংলাদেশি জিহাদিদের সঙ্গে আইএসের সংযোগ স্থাপনে মুখ্য নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছেন।[৫১] ওজাকি ও তাজউদ্দিন সিরিয়ার কেন্দ্রীয় আইএসের সঙ্গে উৎসাহী প্রার্থী বাংলাদেশি জিহাদি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক সংযোগ স্থাপনকারী এবং সুজন আইএসের অন্যতম শীর্ষ তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আইএসের অভ্যন্তরীণ নথিতে ওজাকি, তাজউদ্দিন এবং সুজন আইএসের শুরা পরিষদের সদস্য এবং উইলিয়াহ ও আইএস-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক আবু উবায়দাহ আব আল-হাকিম আলরাকির মাধ্যমে আবু বকর আল-বাগদাদির সংস্পর্শে গিয়েছিলেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৫২] এই পদ্ধতিতেই আইএস বাংলার আমিরের নিয়োগ অনুমোদন করা হয়।[৫৩]

আবু খালেদ আল-বাঙালি নামধারী কার্ডিফবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী সাইফুল হক সুজন ইসলামিক স্টেটের মুখ্য তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি আইএসের হ্যাকিং প্রচেষ্টা, অ্যান্টি-সার্ভিলেন্স প্রযুক্তি এবং অস্ত্র উন্নয়নে সহায়তা করেছিলেন।[৫৪]

সুজন ২০১৪ সালের জুলাইয়ে যুক্তরাজ্য ছেড়ে সিরিয়াতে পাড়ি জমান। তিনি ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে রাকাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলায় নিহত হন। সাইফুল্লাহ ওজাকি ওরফে সুজিত দেবনাথ বাংলাদেশ থেকে জাপানে পাড়ি জমানোর পর হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন।[৫৫] রিতুশুমিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক এই বাংলাদেশি-জাপানি জিহাদি আইএসে বাংলাদেশিদের অন্তর্ভুক্তিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। অন্তত গ্রেপ্তার দুজন সহিংস উগ্রবাদী তাদের আদালতে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে ওজাকির নাম উল্লেখ করেছে।[৫৬] ওজাকির মাধ্যমে যারা সিরিয়াতে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসাদুল্লাহ গালিব, তাহমিদ রহমান সাফি, ডা. আরাফাত হোসেন তুষার, ইব্রাহিম হাসান খান, নাজিবুল্লাহ আনসারি, জুনায়েদ হাসান খান, আশরাফ মোহাম্মদ ইসলাম এবং এ টি এম তাজউদ্দিন।[৫৭] গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি অনুসারে আমিনুল ইসলাম বেগ, সাকিব বিন কামাল এবং আশরার আহমেদ খান চৌধুরী হিজরতে বা বিদেশযাত্রায় তাঁদের উৎসাহিত ও সহযোগিতা করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন।

২০১৫ সালে আইএসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার আগেই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডীয় নাগরিক তামিম চৌধুরীর নেতৃত্বে দাওলাতুল ইসলাম বেঙ্গল নামে সংগঠনটি গঠিত হয়েছিল। তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসলামিক স্টেটের জন্য বাংলাদেশি প্রবাসী জঙ্গিদের দলভুক্ত করতে শুরু করেন। দাওলাতুল ইসলাম বেঙ্গলের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আগে তামিমের গঠিত নিজস্ব সংগঠন জুনুদ আল তাওহিদ আল-খলিফা নামে নিজস্ব সংগঠনও স্বভাবতই আইএসের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মতে, তামিমের পাশাপাশি সারোয়ার জাহান ওরফে মানিক, আবদুস সামাদ ওরফে আরিফ ওরফে মামু, মামুনুর রশীদ রিপন এবং সাকিব আবুল কাসেম তামিমের সংগঠনের প্রধান নেতা ছিলেন।[৫৮] এই সন্ত্রাসী সংগঠনটির দুটি প্রধান শাখা—দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল। ঢাকার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল গাজীপুরভিত্তিক উত্তরাঞ্চল এবং রাজধানীর অন্তর্গত মিরপুরভিত্তিক দক্ষিণাঞ্চল।[৫৯] গোষ্ঠীটি মিরপুরের কয়েকটি জায়গাকে তাদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। সংগঠনটি হামলা বা সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার সদর দপ্তর হিসেবে ঢাকার নিকটবর্তী শহরদ্বয় সাভার ও টঙ্গিকে ব্যবহার করে।

বাংলাদেশি আইএস-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীটি ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৭ সালের জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে অন্তত ৩০টি সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে।[৬০] *রুমাইয়া*র দ্বিতীয় সংখ্যায় ২০১৫ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে আইএসের অভিযানের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। এক বছরের মধ্যে আইএসের উগ্রবাদীরা ২৪টি হামলা চালিয়েছে; উদ্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ৪২ শতাংশ

ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ; ২৭ শতাংশ ছিল খ্রিস্টান; ১৯ শতাংশ ছিল মুরতাদ ও নাস্তিক এবং অবশিষ্ট ১২ শতাংশ রাফিদাহ বা শিয়া ছিল বলে ছকবদ্ধ তথ্যচিত্রে দাবি করা হয়। এই হামলাগুলোর মধ্যে ২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার একটি রেস্তোরাঁতে সশস্ত্র ব্যক্তিদের ঝটিকা হামলা সবচেয়ে লোমহর্ষ এবং ন্যক্কারজনক ছিল। ১২ ঘণ্টাব্যাপী এই হত্যাযজ্ঞের পুরোটা সময়জুড়ে তারা তাদের নেতাদের সঙ্গে ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে যুক্ত ছিল এবং তাদের নিহতদের ছবি প্রেরণ করে। এই হামলায় মোট ২০ জন জিম্মি নিহত হন।[৬১] উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিদেশিকে হত্যার ঘটনায় এই হামলা বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগায়, যার কারণে ইসলামিক স্টেটের নেতারা এই অভিযানকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সফলতা হিসেবে বিবেচনা করে। রেস্তোরাঁটি রাজধানীর কূটনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ওই এলাকায় বসবাসকারী বিদেশিদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়, যাঁদের অধিকাংশই আবার বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত। বিদেশিদের, বিশেষত কূটনীতিকদের গমনাগমনে বাধা সৃষ্টি এবং তাঁদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলা হামলাকারীদের লক্ষ্য ছিল। *দাবিখ*-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধ অনুসারে, এই হামলাগুলো 'ক্রুসেডার জাতিসমূহের' প্রতি আইএসের বার্তা প্রেরণের বৈশ্বিক কৌশলের অংশ যে 'মুসলিমদের জমিনের কোথাও তাদের নাগরিকেরা শান্তি ও নিরাপত্তা উপভোগ করতে পারবে না...যত দিন পর্যন্ত তারা ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে।'[৬২]

বাংলাদেশে আইএস তাদের সদস্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সচ্ছল পরিবারগুলোর প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সুশিক্ষিত তরুণদের আকর্ষণ করে। তাদের এই সক্ষমতাই সম্ভবত সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক। আইএস উগ্রবাদীদের পরিচয় যখন প্রকাশ হতে শুরু হয় (উল্লিখিত ২০১৫ সালে গ্রেপ্তারের পর), তখন দেখা যায়, উচ্চমধ্যবিত্ত এবং সমাজের ধনাঢ্য পরিবারগুলো বস্তুত উদ্বিগ্ন-চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে ইসলামিক উগ্রবাদ কেবল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথাগত এই বিশ্বাসকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে উদীয়মান সহিংস উগ্রবাদী নব প্রজন্ম। আইএসে যোগ দিতে বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া বিপুলসংখ্যক প্রবাসী জঙ্গিদের পাশাপাশি বাংলাদেশে অবস্থানরত অনেক উগ্রবাদী, যারা বিভিন্ন হামলায় জড়িত ছিল, তারা প্রায় সবাই হয় দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা বিদেশে পড়াশোনা করেছে। তাদের মধ্যে অনেকে মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে গিয়েছিল।[৬৩] বাংলাদেশের আইএস-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীটি সফলভাবে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, স্থপতিবিদদের মতো পেশাজীবীদের এবং এমনকি গায়ক ও র‍্যাম্প মডেলদেরও সফলভাবে দলভুক্ত করতে পেরেছে।[৬৪] গ্রেপ্তার উগ্রবাদীদের মধ্যে দেশের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি, সাবেক সামরিক কর্মকর্তা, সাবেক আমলা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার

মতো ব্যক্তির সন্তানেরাও রয়েছে।[৬৫]

আইএস-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী কেবল জিম্মি করা বা আত্মঘাতী হামলার মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং ছোট ছোট পরিসরে লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করাসহ তাদের গৃহীত ইসলামি মতাদর্শের প্রতি হুমকিস্বরূপ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে হত্যার মধ্য দিয়ে তাদের অভিযানের পরিধি বিস্তৃত করেছে। ইসলামিক স্টেটের আনুষ্ঠানিক মুখপাত্র শায়খ আবু মোহাম্মদ আল-আদনানি, কারা তাদের লক্ষ্যবস্তু, সে-সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় বলেন, 'তুমি তাগুতের [আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপসনা করা] সৈন্য, মদদদাতা ও বাহিনীকে আঘাত করবে। তাদের পুলিশ, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যদের এবং তাদের অনুগত সহযোগীদের ওপর অবশ্যই আঘাত করবে। তাদের ঘুম হারাম করো। তাদের জীবন বিষিয়ে দাও এবং তাদের অস্থির করে তোলো। তুমি যদি একজন কাফির আমেরিকান বা ইউরোপীয়, বিশেষত নোংরা ও কদর্য ফরাসি বা অস্ট্রেলীয় বা কানাডিয়কে হত্যা করতে পারো...ইসলামিক স্টেটবিরোধী জোটে যোগদানকারী দেশগুলোর নাগরিকদেরসহ, তাহলে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো, তাদের যেকোনো কৌশলে হত্যা করো, সে যেভাবেই হোক না কেন।'[৬৬] এই নির্দেশনানুসারে, বাংলাদেশি আইএস-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীটি আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বিরোধী জোটে শামিল দেশগুলোর নাগরিকদের এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। এ ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের, যেমন শিয়া, আহমদিয়া এবং বাহাইদের তারা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। হিন্দুদের সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয় এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে হিন্দু সম্প্রদায় ও ভারত দেশ হিসেবে আইএসের প্রধান আঞ্চলিক শত্রু। আইএসের বিভিন্ন প্রকাশনা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি প্রধান লক্ষ্য বারবার উল্লেখ করা হয়েছে: গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বাংলাদেশে একটি শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আইএস উগ্রবাদীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে জিহাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

বাংলাদেশের আইএস জিহাদিদের সহিংসতা জায়েজ করার বয়ান

বাংলাদেশের আইএস জিহাদিদের 'মহীয়ান' বয়ান অনুসন্ধানে এই অংশে জিহাদি বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হবে, যার মধ্যে আইএসের প্রচারমাধ্যম শাখার অনলাইন সাময়িকী, ভিডিও বার্তা, টেলিগ্রাম চ্যানেল ও ছকবদ্ধ তথ্যচিত্র রয়েছে।

সংকট বিনির্মাণ

বিভিন্ন বিবৃতিতে, আইএস উগ্রবাদীরা বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তাগুত ('যে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী আল্লাহর পরম শক্তিকে অগ্রাহ্য করে এবং মানুষকে

শোষণ করে'[৬৭]) এবং সরকারকে ইসলামবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা বিশ্বাস করে, গণতন্ত্র হচ্ছে শিরকি (আল্লাহ ব্যতীত কারও উপাসনা করা) মতাদর্শ, কারণ, গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলো মানুষের তৈরি করা। আইএসের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষত বিএনপি, আওয়ামী লীগ (এএল) এবং জামায়াতে ইসলামী মুরতাদিন (ইসলাম থেকে পথভ্রষ্ট)।

সিরিয়ায় ধারণকৃত আইএসের অপপ্রচারমূলক ভিডিওতে তিন বাংলাদেশি জিহাদি বাংলাদেশে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলাকারীদের প্রশংসা করে এবং জিহাদের আহ্বান জানায়।[৬৮] এক জিহাদি তার বক্তব্যে গণতন্ত্রকে (অথবা 'মানবসৃষ্ট আইন') প্রথম সমস্যা হিসেবে দায়ী করেছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র সমাধান বলে উল্লেখ করেছে। তার ভাষায় : 'আমরা যদি আজকের বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে তাকাই, [আমরা দেখতে পাব] সরকার মানবসৃষ্ট আইন দ্বারা আল্লাহর [ঐশ্বরিক] নির্দেশকে স্থলাভিষিক্ত করছে,' যার কারণে তারা তাগুত এবং কাফির হয়ে গেছে। আইএসের মনে করে, জিহাদ মানে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম, যা ফরজ-ই-আইন হয়ে (প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক) পড়েছে।[৬৯] অনুরূপভাবে, আরেকজন আইএস উগ্রবাদী ওই ভিডিওতে গণতন্ত্রকে শিরক মতাদর্শ হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং শরিয়াহ আইনকে গণতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সে তিন ধরনের ব্যক্তির সমালোচনা করে—বাংলাদেশ সরকার, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের, সাধারণ জনগণ এবং গণতন্ত্রের সমর্থকদের। সে প্রশ্ন করে, কীভাবে তারা 'গণতন্ত্র নামক এই শিরক মতাদর্শকে সমর্থন করে', যেখানে আল্লাহর পরিবর্তে মানুষ দেশের আইন নির্ধারণ করে।[৭০] অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় অনলাইন সাময়িকী *দাবিখ*-এ, যেখানে বলা হয়েছে যে 'গণতন্ত্র হচ্ছে সেই ধর্ম, যা মানুষের আইন প্রণয়ন এবং হালাল ও হারাম নির্ধারণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে, যা কিনা একমাত্র আল্লাহর হক বা এখতিয়ার।'[৭১]

তাদের অনলাইন সাময়িকীগুলোতে আইএস তিনটি রাজনৈতিক দল—আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীকে (জেইআই) বাংলাদেশে 'মানবসৃষ্ট আইন' বা গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার জন্য দায়ী করেছে। গোষ্ঠীটি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারকে 'সেক্যুলার মুরতাদিন' আখ্যায়িত করে ব্যাপক সমালোচনা করে এবং এই সরকারের কর্মচারীদের, বিশেষত আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করে। অনেকগুলো হামলার দায় স্বীকারের পরও তাদের দেশে অবস্থানের বিষয়টি সরকার অস্বীকার করার পর আইএস নেতারা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তাদের অনলাইন সাময়িকী *দাবিখ*-এ উদ্ধৃত, 'বর্তমান সেক্যুলার মুরতাদিন আওয়ামী লীগ সরকার অন্য দুই মুরতাদিন জাতীয়তাবাদী বিএনপি এবং সংসদীয় জামায়াতে ইসলামীর ওপর রাজনৈতিক চাপ

সৃষ্টির প্রচেষ্টা হিসেবে বাস্তবতাকে ঘোলাটে করে দোষারোপের খেলা খেলছে।'[৭২] এ ক্ষেত্রে অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে, বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে সহিংস উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর যোগসাজশে আওয়ামী সরকারের অভিযোগের বিপরীতে *দাবিখ*-এর নিবন্ধে বিএনপি ও জামায়াতকে বহুবার সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের মুরতাদিনদের দোসর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই দুটি রাজনৈতিক দলকে স্থানীয় জিহাদি গোষ্ঠীর (জেএমবি) শীর্ষ নেতাদের বিশেষত শায়খ আবদুর রহমানের বিচার ও ফাঁসির জন্য দায়ী করে সমালোচনা করা হয়। সাবেক বিএনপি-জামায়াত জোটের নীতিনির্ধারক ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা তাদের অপকর্মের জন্য 'শাস্তি' ভোগ করেছে বলে *দাবিখ*-এর এক নিবন্ধে দাবি করা হয়। উদাহরণ হিসেবে তারা বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (সাবেক বিডিআর, বর্তমানে বিজিবি) বিদ্রোহে বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার নিহত হওয়ার ঘটনা এবং আদালতের বিচারে অনেক জামায়াত নেতার (এবং একজন বিএনপি নেতাসহ) ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের উল্লেখ করে।[৭৩]

জামায়াতের সঙ্গে জিহাদিদের সম্পর্কের অভিযোগের বিপরীতে আইএস এই ইসলামি দলটিকে 'অগণিত কুফরি ও শিরকি কর্ম করার অভিযোগে অভিযুক্ত রাজনৈতিক দল বলে মনে করে।'[৭৪] *দাবিখ*-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তথাকথিত 'বাংলার খিলাফতের যোদ্ধাদের' আমির আবু ইব্রাহিম আল হানিফ বলেন, যদিও প্রান্তিক পর্যায়ে জামায়াতের অনুসারী ও সমর্থকদের অনেকে তাদের শিরকের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছে এবং বাংলার খিলাফতের যোদ্ধাদের দলে যোগ দিয়েছে, কিন্তু জামায়াতের নেতৃত্ব 'তাদের ধ্বংস ও অপমানের পথে অনড় রয়েছে...।'[৭৫]

সামাজিক পর্যায়ে, এক সম্প্রদায়/উম্মাহ হিসেবে মুসলিমরা তাদের বিশ্বাসের কারণে অপমান ও অভাবের সম্মুখীন বলে সংকট বিনির্মাণ করার চেষ্টা করছে আইএস উগ্রবাদীরা। গোষ্ঠীটির সামাজিক সংকট বিনির্মাণ অনুসারে ইসলামিক সংস্কৃতি আজ স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে হুমকির সম্মুখীন। এ ছাড়া সংকট বিনির্মাণের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে স্থানীয় ও বৈশ্বিক শত্রুদের বা 'অন্যদের' চিহ্নিতকরণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক 'অন্যরা' হলো পশ্চিমারা বা 'ক্রুসেডাররা' এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরা। স্থানীয় পর্যায়ে, আইএস ভাষ্যের লক্ষ্যবস্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের পাশাপাশি সাধারণত হিন্দু, বৌদ্ধ ও ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানরা। বিশেষত তাদের বয়ান বাংলাদেশের ইসলামিক সংস্কৃতির জন্য ভারতীয় সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক 'দখলদারি' প্রধান হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন জিহাদি তার প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় বলে, পৃথিবীর সব মুসলিমকে এক 'শোষিত ও অপমানিত' জাতি মনে করতে হবে।[৭৬] সে মুসলিম সম্প্রদায়ের অপমান ও নিপীড়নের প্রতিশোধ নিতে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার মতো আরও অনেক

হামলা চালানোর আহ্বান জানায়। সে মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক বন্ধন এবং জিহাদের প্রয়োজনীতা ব্যাখ্যায় বলে, 'উম্মাহ (মুসলিম সম্প্রদায়) হচ্ছে শরীরের মতো; যদি শরীরের কোনো অংশ আঘাত পায়, তার ব্যথা সারা শরীরে অনুভূত হয়। এ জন্য যখন আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার জোট শাম [সিরিয়া], ইরাক এবং লিবিয়ায় [যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে] হামলা চালাচ্ছে, শত শত মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করছে, এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমাদের মুজাহিদীন ভাইদের কষ্ট দেয়। আর এ জন্যই তাদের মুসলিম ভাইবোনদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে ক্রুসেডারদের যেখানে পাবে, সেখানেই হত্যা করতে হবে।'[৭৭] আইএস বাংলার আমির আবু ইব্রাহিম বাংলাদেশি মুসলিমদের চার ধরনের সংকট চিহ্নিত করেছেন, যার জন্য দায়ী প্রতিবেশী ভারত ও বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দুরা।[৭৮] প্রথমত, তিনি বিশ্বাস করেন, ভারত ও বাংলাদেশের হিন্দুরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধরত'। তিনি মনে করেন, ভারতের হিন্দুরা খোলামেলাভাবে মুসলিম জনগণকে নিপীড়ন করছে, যদিও বাংলাদেশি হিন্দুরা 'এখানে সংখ্যালঘু বিধায় গোপনে এবং কৌশলে একই কাজ করছে।'[৭৯] দ্বিতীয়ত, আবু ইব্রাহিম বলেন, বাংলাদেশের ইসলামিক সংস্কৃতি ধ্বংস করার ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়াসে বাংলাদেশি হিন্দুরা সহযোগিতা করছে। তৃতীয়ত, তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের হিন্দুরা গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে 'ফাইসাহর (নগ্নতা ও অশ্লীলতা) বিস্তার' ঘটাচ্ছে। শেষত, আবু ইব্রাহিম বাংলাদেশি মুসলিমদের এই বলে হুঁশিয়ার করেন যে, তিনি মনে করেন, বর্তমান 'মুরতাদ, ধর্মনিরপেক্ষ' সরকার বহু হিন্দুকে চাকরিতে নিয়োগ দান করেছে এবং মুসলিম কর্মকর্তাদের সুযোগবঞ্চিত করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোতে উচ্চ পদে পদোন্নতি দিয়েছে, কারণ, সরকার মনে করে, হিন্দুরা (রাজনৈতিক) দলের প্রতি যারপরনাই অনুগত।[৮০]

আশ্চর্যজনকভাবে, শরিয়াহ আইনের অভাব বা মুসলিম সম্প্রদায়ের অপমানের ধারণা ব্যতীত ব্যক্তিগত সংকটহেতুও কেউ কেউ সহিংস উগ্রবাদে যোগ দেয়। বাংলাদেশে এমন অনেক ঘটনা আছে, যাতে দেখা যায় বিবাহবিচ্ছেদ, ঘনিষ্ঠজনের মৃত্যু কিংবা সম্পর্কের ভাঙনের মতো বিষয়গুলো একজন ব্যক্তিকে আইএসের দলভুক্তকরণ কৌশলের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকিতে ফেলে।[৮১] কুইনটান উইকটরোইসের গবেষণা থেকে পাওয়া যায়, এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 'ভিন্ন ভাবনার' জন্ম দিতে পারে। সহিংস উগ্রবাদী গোষ্ঠীতে যোগদানের ব্যাপারে ব্যক্তির মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে তাকে উগ্রবাদী বার্তাগুলোর প্রতি উন্মুখতা বা সংবেদনশীলতা অন্যতম পূর্বশর্ত বলে তিনি যুক্তি দেন। সাধারণত, ব্যক্তিবর্গ 'উগ্র' বা 'অযৌক্তিক' বার্তাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। যদিও কোনো সংকট বিনির্মাণ 'ভিন্ন ভাবনা' সঞ্চারের

মাধ্যমে আগের মেনে নেওয়া বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে। এটি ব্যক্তির বিকল্প ব্যাখ্যা এবং অন্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সম্ভাবনা বাড়ায়। গুরুত্ব, স্বীকৃতি ও পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা জিহাদি গোষ্ঠীতে যোগদান বা তাদের অবস্থানকে সমর্থন করতে প্ররোচিত করে বলে গবেষকেরা জানতে পেরেছেন।[৮৩] মতাদর্শ প্রচারকেরা বা দলভুক্তকারীরা জিহাদি পার্থিব দুনিয়ার গুরুত্বহীনতা এবং জিহাদের জন্য ত্যাগের সম্মান ও স্বীকৃতিকে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করে। অনেকগুলো ঘটনায় সুপ্রতিষ্ঠিত পেশাজীবী এবং সচ্ছল পরিবারের তরুণেরা ব্যক্তিগত সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন এবং জীবনের 'সত্যিকারের' স্বীকৃতি ও পুরস্কারের প্রত্যাশায় আইএসে যোগ দিয়েছেন। *রুমাইয়া*য় প্রকাশিত এক নিবন্ধে হোলি আর্টিজান বেকারি হামলায় জড়িত একজন হামলাকারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এরূপ: 'যদিও তিনি ধর্মের পথে ফেরত আসার আগে বন্ধুবান্ধবের কাছে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার জন্য পরিচিত ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর কৃপায় তিনি বুঝতে পারেন এই নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের চেহারা, সম্পদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য বৈষয়িক মোহ এবং প্রাপ্তির প্রতিযোগিতার চাইতে পৃথিবীতে একজন বিশ্বাসীর জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাস এবং পথনির্দেশ (হেদায়েত) সবচেয়ে দামি...'।[৮৩] আইএস দলভুক্তকারীরা ব্যক্তিগত সংকট গুরুত্বসহকারে তুলে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করে যে একজন ব্যক্তি জীবনে যা কিছুই অর্জন করুক না কেন, জিহাদের পথ বেছে নেওয়া ব্যতীত জীবন অর্থহীন ও অসম্পূর্ণ।

সমাধান বিনির্মাণ

ইসলামিক স্টেট দাবি করে, তারা শুধু অধুনা বিশ্বের সংকট-জর্জরিত মুসলিমদের দুরবস্থা তুলে ধরে, তা-ই নয়, বরং এই সংকটের সমাধানও তাদের বয়ানে তুলে ধরে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের বয়ানানুযায়ী গণতন্ত্র বা মানুষের শাসন হচ্ছে মূল সমস্যা। তারা গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে থাকে, যেখানে তাদের ইসলামি ব্যাখ্যা অনুসরণ করা হবে। আইএস ভাষ্যে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সংগ্রামে অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের দাবির উল্লেখ একাধিক নথিতে পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের জন্য আইএস উগ্রবাদীদের যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে, সে সম্পর্কে বাংলাদেশ আইএসের আমির আবু ইব্রাহিম এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বাংলাদেশকে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বৈশ্বিক জিহাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বলে মনে করেন।[৮৪] আইএসের জন্য বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতের পূর্ব দিকে অবস্থান, যেখানে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের (আইএস ওয়ালিয়াত খোরাসান) অবস্থান পশ্চিম দিকে। তারা ভারতের অভ্যন্তরে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকে গেরিলা হামলা চালানোর

অভিপ্রায়ে বাংলাদেশে জিহাদের শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি করার পরিকল্পনা করছে। ভারতে সক্রিয় আইএস-সংশ্লিষ্ট সহিংস উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগসাজশে তারা ভারতে অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে চাইছে। বাংলাদেশে অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করার পর তারা প্রথমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে এবং তারপর ভারতীয় ভূখণ্ডে নিয়মিত সেনাবাহিনী-সহকারে প্রবেশ করে ভারতীয় উপমহাদেশকে সম্পূর্ণ 'স্বাধীন/মুক্ত' করবে। তারা বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মনে করে, কারণ, এ দেশকে ব্যবহার করে মিয়ানমারে 'জিহাদের ভিত্তিপ্রস্তর' স্থাপন করা সম্ভব।[৮৫]

এই লক্ষ্যে, আইএসের মতাদর্শ প্রচারক ও দলভুক্তকারীরা আফগানিস্তান থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত বিস্তৃত শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জল্পনাকল্পনা করছে। এই ভাবনা যতই অসম্ভব এবং সুদূরপরাহত হোক না কেন, আইএস উগ্রবাদীদের স্বপ্নের কোনো পরিসীমা নেই। এ ক্ষেত্রে আইএস উগ্রবাদী তাহমিদ শফির উদাহরণ দেওয়া যায়, যিনি বিশ্বাস করেন যে বিশ্বে শিগগিরই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, শুধু ভারতীয় উপমহাদেশ একাকী পড়ে থাকবে: 'বাংলাদেশের তাগুত সরকারকে এটাই আমি বলতে চাই। বাংলাদেশে যে জিহাদ এসেছে, যে জিহাদ আজ আপনি দেখছেন, এরূপ জিহাদ আপনি আগে কখনো দেখেননি...আপনি এই জিহাদ রুখতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জয়লাভ করছি ও আপনি হারছেন এবং খিলাফতের শাসন সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত।'[৮৬]

সামাজিক পর্যায়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের অপমান ও নিগ্রহের অবসান ঘটবে, মানবসৃষ্ট আইন উৎখাত করে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজের অবিচার দূর হবে বলে আইএসের ভাষ্যে আশ্বস্ত করা হয়েছে। এই স্বপ্নিল 'প্রতিশ্রুত ভূমি' জিহাদিদের মনস্তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'ওদের' বিরুদ্ধে 'আমাদের' বিজয়ের অঙ্গীকার গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসেবে জিহাদিদের প্রেরণা জোগায়। বাংলাদেশে, জিহাদিরা স্থানীয় হিন্দুদের 'ওরা' এবং স্থানীয় মুসলিমদের জন্য 'সংকটের' কারণ হিসেবে উপস্থাপন করে। তাদের প্রস্তাবিত সমাধান হলো হিন্দু ও মুসলিমদের 'মেরুকরণ', যার ফলে অরাজকতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশে সম্ভাব্য ভারতের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্ররোচিত হবে। এই কৌশল সম্পর্কে আবু ইব্রাহিমের সাক্ষাৎকারে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর ব্যাখ্যায়: '...আমরা বিশ্বাস করি, স্থানীয় হিন্দুদের বড়সংখ্যককে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করা পর্যন্ত এবং এই অঞ্চলে মেরুকরণ সৃষ্টি করে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পৃথক্করণ করা ছাড়া বাংলায় শরিয়াহ অর্জন সম্ভব হবে না।'[৮৭] হোলি আর্টিজান বেকারির চাপাতিধারী হামলাকারীরা তাদের বক্তব্য ধারণ করে হামলার পর অপর একটি ভিডিও প্রকাশ করে। ১৫ মিনিট দীর্ঘ এই ভিডিওতে বাংলা ও আরবি ভাষায়

আইএস উগ্রবাদীরা বাংলাদেশি জিহাদিদের ইরাক, সিরিয়া ও অন্যত্র মুসলিমদের ওপর হামলার প্রতিশোধ নিতে ক্রুসেডার, নাস্তিক ও মুরতাদদের ওপর হামলা চালানোর ডাক দেন।[৮৮] এই ভিডিও প্রথম টেলিগ্রামে আইএসের নাসির চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়। এই ভিডিও প্রকাশের পূর্বে আইএস বাংলা মিডিয়া আত-তামকিনের ওয়েবসাইটে তারা 'বিলাদ-আল বেঙ্গল মিডিয়া অফিস' প্রযোজিত ভিডিওটি প্রকাশ করবে বলে ঘোষণা দেয়।[৮৯]

জিহাদি ভাষ্যে সংকটের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাধানও দেয়া হয়। বয়ানানুসারে সমাধান হচ্ছে বিজয়ীদের শাহাদতবরণ তাদের অর্জিত চূড়ান্ত স্বীকৃতি। একজন আইএস উগ্রবাদীর ব্যাখ্যায় : 'আমরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব। হয় আমরা জিতব বা আমরা জয় পাব অথবা আমরা শাহাদতবরণ করব, যার অর্থ শাহাদত। সুতরাং আমাদের হারানোর কিছু নেই।'[৯০]

অতএব, কেউ বৈশ্বিক জিহাদে সম্পৃক্ত হলে যে 'পুরস্কার ও গুরুত্ব' পাবে, জিহাদি বয়ানে তার ওপর জোর দেওয়া হয়। সচ্ছল পরিবারের এবং/অথবা পেশাগত জীবনে সফল ব্যক্তিরা বহুবিধ ব্যক্তিগত কারণে নাজুক এবং নিরাশ হয়ে পড়তে পারে অথবা জীবনকে আরও অর্থপূর্ণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সামাজিক স্বীকৃতি প্রত্যাশা করতে পারে।[৯১] জিহাদি সাময়িকীগুলোতে প্রকাশিত ঘটনাগুলোতে, ভিডিওগুলোর ধারাবিবরণীতে সতর্কতার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করলে জীবনের অভাব ঘুচবে এবং জিহাদ জীবনকে পরিপূর্ণ করে, এই বার্তা প্রচার করা হয়। তা ছাড়া জিহাদিরা তাদের নিকটজনদের সঙ্গে সম্পর্কের বিস্তৃতির মাধ্যমে আন্তগোষ্ঠী পরিচয় তৈরি করে, যেখানে ব্যক্তিরা শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলায় বা সম্মুখ লড়াইয়ে তাদের জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে পরিচিতজনদের স্বীকৃতি লাভের প্রয়াস পায়। পরকালের পুরস্কার, অনন্ত সুখের বেহেশতের প্রতিশ্রুতি জিহাদি অনুপ্রেরণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সহিংস উগ্রবাদীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে তারা ন্যায়সংগত উদ্দেশ্যে অর্থপূর্ণ কিছু করছে, তারা বিশ্বাস করে জিহাদি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং হামলায় জড়ানোর মাধ্যমে তারা জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে। উপরন্তু জিহাদিরা (বিশেষত তরুণেরা) 'বীরত্ব' কিংবা 'দুঃসাহসিকতা' দেখাতে সহিংস উগ্রবাদে জড়ায়।[৯২]

যৌক্তিকতা বিনির্মাণ

জিহাদের যৌক্তিকতা বিনির্মাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর ফলে সহিংস উগ্রবাদী তৈরির প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত হয়। একজন রক্ষণশীল মুসলিম সংকট-যৌক্তিকতা বয়ানে বিশ্বাস করতে পারে, যেমন ইসলাম, ইসলামিক সংস্কৃতি এবং এক সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমরা 'পশ্চিমা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন'-এর হুমকির সম্মুখীন এবং শরিয়াহ আইনভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই এই সংকটের

সমাধান। তা ছাড়া এই সংকট থেকে সমাধানে পৌঁছানোর একমাত্র পথ হচ্ছে জিহাদ (যে সশস্ত্র সংগ্রাম বেসামরিক ব্যক্তি হত্যা অনুমোদন করে), এরূপ বিশ্বাস উগ্রবাদে দীক্ষিত ব্যক্তিকে সহিংস উগ্রবাদীতে পরিণত করে। বাংলাদেশের আইএস উগ্রবাদীরা তাদের বিভিন্ন প্রকাশনায় শরিয়াহভিত্তিক ন্যায়রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র পথ সহিংস জিহাদের প্রয়োজন সম্পর্কে বারবার উল্লেখ করেছে। আবু ইব্রাহিমের আহ্বান : 'আমি আপনাদের পরামর্শ দেব আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে এবং আপনাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করতে, যেহেতু এটি সব সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য ফরজ। কিতলের (যুদ্ধ) পথ ব্যতীত ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার আর কোনো উপায় নেই। সুতরাং দুনিয়াকে পেছনে ফেলুন এবং আমাদের সঙ্গে শিগগির যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিন।'[৯৩]

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইএস বয়ানগুলো সহিংস হামলাগুলোর পক্ষে তিনভাবে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করে। প্রথমত, তারা বলে যে জিহাদ ন্যায়সংগত, কারণ, রাষ্ট্র 'ইসলামবিরোধী' ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম। অতএব, এই শাসনব্যবস্থা 'দুর্নীতিগ্রস্ত', 'ইসলামবিরোধী' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক'। দ্বিতীয়ত, বর্তমান এবং আগের সরকারগুলো 'ক্রুসেডারদের' এবং 'ইসলামের শত্রুদের' হাতের পুতুল। ভাষ্যে বাংলাদেশি সরকারকে 'পুতুল' আখ্যায়িত করে যুক্তি দেওয়া হয় যে সহিংস জিহাদই সরকারকে উচ্ছেদ করা এবং শরিয়াহভিত্তিক ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বাস্তবসম্মত পথ। বাংলাদেশি আইএস-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীটি অনেক ক্ষেত্রে তাদের সমর্থকদের কাছে শক্তির জানান দিতে এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সহিংস হামলা জিহাদের অপরিহার্য অংশ—এই বার্তা অনুসারীদের কাছে পাঠাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নেয়। তৃতীয়ত, অন্য কোনো ইসলামি রাজনৈতিক দলের শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য নেই বলে জিহাদি ভাষ্যে দাবি করা হয়। এ ক্ষেত্রে একমাত্র আইএসই বাংলাদেশে 'সত্য' এবং 'মৌলিক' ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

সামাজিক পর্যায়ে, ধর্মীয় 'কর্তব্য' এবং নিজেদের সম্প্রদায় ও ভ্রাতৃত্বকে রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব—উদ্ধৃত করে দেওয়া বয়ানে সহিংসতার পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। অনুরূপভাবে, জিহাদকে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার এবং অপমানের ইতি টানতে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।[৯৪] এসব বয়ানে প্রায়ই অতীতের ঘটনাগুলোর বরাত দেওয়া হয় এবং সমকালীন জিহাদকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উদাহরণ টানা হয়। জিহাদি বিষয়বস্তুতে প্রায়ই নবীজির নির্দেশনাকে উদ্ধৃত করে বলা হয় : 'মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমার সম্পদ, জীবন ও জবান দ্বারা জিহাদ করো।'[৯৫] সামাজিক পর্যায়ের অন্য উল্লেখযোগ্য দিক হলো কীভাবে সহিংস উগ্রবাদীরা বেসামরিক জনগণের ওপর হামলার পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরছে। *রুমাইয়া*তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বাংলার

আইএস উগ্রবাদীদের সামরিক ও গুপ্ত অভিযানের সাবেক প্রধান আবু দুজানাহ আল-বাঙালি (তামিম চৌধুরী) বেসামরিক জনগণের ওপর হামলার পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে যুক্তি দেন যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খরচ 'বিমূর্ত শূন্যতা থেকে আসে না; বরং তারা ক্ষমতায় আসে তাদের নির্বাচনী এলাকার নাগরিকদের আশীর্বাদের বদৌলতে যারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশ নিয়েছে অথবা এর ফলাফল মেনে নিয়েছে।'[৯৬] তাঁর কাছে, বেসামরিক জনগণ আর নিরীহ সাধারণ জনগণ নয়, যেহেতু তারা যুদ্ধগুলোর বৃহৎ ব্যয় নির্বাহে তাদের করের টাকা প্রদান করছে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর প্রণীত নীতিমালাগুলোকে বৈধতা দান করছে।[৯৭] *রুমাইয়া*তে প্রকাশিত অন্য এক নিবন্ধে বলা হয়েছে যে 'অন্যান্য কাফির বেসামরিক জনগণের রক্ত ঝরানো, যা ইতিমধ্যে ছড়ানো মুবাহ (জায়েজ) অপেক্ষা মুসলিমদের এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ক্রুসেডার বেসামরিক জনগণের রক্ত ঝরানো বেশি উচিত।'[৯৮] জিহাদিরা তাদের অনেক বিষয়বস্তুতে 'মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সুরক্ষা' কারণ হিসেবে ব্যবহার করে। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে আশি শতাংশের বেশি জনগণ মুসলিম, সেখানে সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের যুদ্ধ, ধ্বংস ও মৃত্যুর ভয়াবহতার চিত্র প্রতিনিয়ত হতাশা এবং ক্রোধের জন্ম দেয়। জিহাদিরা সহানুভূতিশীল এবং সম্ভাব্য দলভুক্ত উপযোগীদের এই বলে ফাঁদে ফেলে যে তারাই কেবল তাদের মুসলিম ভাইদের 'রক্তের প্রতিশোধ' নিতে পারে। একজন জিহাদি জিহাদের প্রতি আহ্বান জানান এভাবে: হে আমার ভাইয়েরা! [একদা] আমরা আফগানিস্তানে জিহাদ, শামে [সিরিয়া] জিহাদ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জিহাদের স্বপ্ন দেখতাম। এখন জিহাদ আমাদের দোরগোড়ায় উপস্থিত। এখন আমাদের সময় মুজাহিদীনদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার, যারা বাংলাদেশে [ইসলামিক স্টেটের] অধীনে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টারত।[৯৯]

ব্যক্তিপর্যায়ে কীভাবে কেবল জিহাদে অংশগ্রহণই জীবনের সত্যিকারের পুরস্কার দেয়—জিহাদি বয়ানে তা তুলে ধরা হয়। এই সত্যিকারের পুরস্কার ব্যক্তির স্বীকৃতি, গুরুত্ব বৃদ্ধি ও পার্থিব পৃথিবীতে ত্যাগ ও সাহসিকতার জন্য গৌরব অর্জন থেকে শুরু হয় এবং পরকালের অনন্ত সুখ ও সম্মান অর্জনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ হয়। কীভাবে জিহাদিরা সম্ভাব্য দলভুক্ত উপযোগীদের এবং অন্য উগ্রভাবাপন্নদের কাছে আইএসের জন্য আত্মাহুতি ন্যায়সংগত প্রমাণ করে—এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ *রুমাইয়া*তে প্রকাশিত একজন জিহাদির স্তুতি।[১০০] এই নিবন্ধজুড়ে নিহত জিহাদির 'আত্মত্যাগের সাহসিকতার' জন্য প্রশংসা করা হয়েছে।[১০১] সম্ভবত এই নিবন্ধের লক্ষ্য ছিল মূলত অল্পবয়সী, সচ্ছল বাংলাদেশি তরুণেরা, যারা সচ্ছল পরিবার থেকে আসা এই জিহাদির জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পায়। এই স্তুতিতে ব্যাখ্যা করা হয়, কেন জিহাদিদের 'দুনিয়াবি জীবনের ঠুনকো আনন্দ' পরিত্যাগ করা উচিত এবং

আল্লাহর 'সত্য' পথ আঁকড়ে ধরা উচিত। 'ঠুনকো আনন্দ' বলতে তারা শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা বা বিয়েকে বুঝিয়েছে। আইএসে যোগদান করার আগে, জিহাদির বাবা তাকে গাড়ি কিনে দিয়েছেন এবং পারিবারিক ব্যবসার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, আর তাকে বিয়ে করে থিতু হতে বলেছেন। এই নিবন্ধে তরুণ জিহাদিদের এ-জাতীয় 'প্রলোভন' প্রত্যাখ্যানের পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয় এবং এই জিহাদি দুনিয়াবি জীবনের তাৎপর্যহীন আকর্ষণের স্থলে বেহেশতের 'অনন্ত উদ্যানকে বেছে নিতে সমর্থ' হয়েছে বলে যুক্তি দেওয়া হয়।[১০২] ইসলামিক স্টেটের জন্য বহু রোমহর্ষ শিরশ্ছেদকারী 'জিহাদি জন' নামে পরিচিত আবু মুহারিব আল-মুহাজির প্রতি 'তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা' থেকে জিহাদি 'আবু মুহারিব' নাম গ্রহণ করেছে বলে নিবন্ধে যুক্তি দেওয়া হয়।[১০৩] ২০ বছরের মাঝামাঝি বয়সী ব্রিটেনের নাগরিক জিহাদি জন তার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা এবং ব্রিটিশ উচ্চারণের জন্য নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি জিহাদিদের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি করতে পেরেছিল, কারণ, তারা তার জীবনধারা এবং বেড়ে ওঠার সঙ্গে নিজেদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল। জিহাদি জনের মতো এই সব বাংলাদেশি জিহাদি ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত বেসরকারি বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। এই সব জিহাদি বাংলাদেশে বসবাস করলেও তারা প্রচলিত পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ করে বেড়ে উঠেছে, তাদের অনেকেই বাংলা অপেক্ষা ইংরেজিতে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বীরত্বের সন্ধানে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে সিরিয়াতে যাওয়া বড়সংখ্যক প্রবাসী জঙ্গিদের দ্বারা নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি জিহাদিরা আইএসে যোগদানে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

তা ছাড়া জিহাদি বিষয়বস্তুজুড়ে পুরস্কারের ভাবনা সহিংস উগ্রবাদীদের অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুরস্কারগুলো বিভিন্নরূপে আসে—শাহাদতের গৌরব, সহচর সন্ত্রাসীদের শ্রদ্ধা, সুনাম ও গুরুত্ব অর্জন এবং বেহেশতের নিশ্চয়তা। উদাহরণস্বরূপ, হোলি আর্টিজান বেকারি হামলায় নিহত অন্যতম হামলাকারী রোহান ইমতিয়াজকে (ওরফে আবু রাহিখ) তার সাহসিকতার জন্য 'একাই এক সেনাবাহিনী' বলে প্রশংসা করা হয়। *রুমাইয়া*য় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে ইমতিয়াজ যখন খবর পায় যে সে হামলা/অভিযানের জন্য নির্বাচিত হয়েছে, সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং 'এই মহান নেয়ামত ও তাকে কবুল করার জন্য আল্লাহ'র প্রতি শুকরিয়া আদায় করে।'[১০৪] এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, শাহাদতের মূল্য ও গৌরব জিহাদিদের কাছে কতটা বেশি। অন্যরা আত্মত্যাগকারী জিহাদিদের কর্মকাণ্ডকে যে মূল্য ও সম্মান দেয়, তা ভবিষ্যৎ জিহাদিদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এটি এক জিহাদির ভিডিও বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন সে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলাকারীদের প্রশংসা করে বলে: 'ভাইয়েরা! আপনারা বাংলাদেশে যা ঘটিয়েছেন, তা আগে কখনো ঘটেনি। ভাইয়েরা, আপনারা

ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন! আল্লাহ আপনাদের শাহাদত/আত্মত্যাগ কবুল করুন, আমিন! আপনারা অসাধারণ কাজ করেছেন।'[১০৫] সংক্ষেপে জিহাদিদের বয়ানের সারাংশ ছক ১-এ তুলে ধরা হলো।

ছক ১ : জিহাদি সংকট-যৌক্তিকতা-সমাধান বয়ান

পর্যায়	সংকট বিনির্মাণ	জিহাদের যৌক্তিকতা	সমাধান বিনির্মাণ
রাষ্ট্রীয় পর্যায়	বর্তমান রাষ্ট্র ইসলামবিরোধী এবং গণতন্ত্র হলো শিরক	সহিংস জিহাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ন্যায়রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে	এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে আইএস অনুমোদিত ইসলামিক ব্যাখ্যা অনুসরণ করবে
সামাজিক পর্যায়	সমাজে অন্যদের (বহিরাগত গোষ্ঠী) উপস্থিতি ও প্রভাব বিস্তারের কারণে; ইসলাম/ইসলামিক সংস্কৃতি স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে হুমকির সম্মুখীন; মুসলিমরা তাদের বিশ্বাসের জন্য অপমান ও নিগ্রহের সম্মুখীন হচ্ছে।	অন্যায় ও অপমানের ইতি টানার জন্য জিহাদ করা ধর্মীয় দায়িত্ব। শত্রু এবং তাদের সমর্থকদের আক্রমণ করা বৈধ। শত্রুরা মানুষ নয়। বেসামরিক/সাধারণ মানুষ হত্যা করা বৈধ।	মুসলিমদের অপমান ও নিগ্রহের অবসান।
ব্যক্তিপর্যায়	ব্যক্তির জীবনের অর্থ, স্বীকৃতি, পুরস্কারের ঘাটতি	জিহাদ থেকে গৌরব, সম্মান ও গুরুত্ব পাওয়া যায়	জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। অন্য জিহাদিদের স্বীকৃতি পায়।

উপসংহার

এই নিবন্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইএস-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর বিকাশ এবং তাঁর উৎস, নেতৃত্ব, লক্ষ্যবস্তু ও লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে। সিরিয়ার ইসলামিক স্টেটের জন্য কীভাবে বাংলাদেশি প্রবাসী জঙ্গিদের দলভুক্ত করা হয়েছে এবং কারা বাংলাদেশি আইএস

সংযোগের পেছনে মুখ্য ব্যক্তি, তা এই নিবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জিহাদি বিষয়বস্তুগুলো নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণের পর এই নিবন্ধে জিহাদি বয়ানগুলোর প্রধান তিনটি ধাঁচের/মূল ভাবের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমত, জিহাদির সম্ভাব্য সংকট বিনির্মাণ কল্পনা করে, যে পরিস্থিতিতে জিহাদিরা দেখায় যে মুসলিমরা শুধু মুসলিম পরিচয়ের কারণে শোষিত হচ্ছে; ইসলামিক সংস্কৃতি এবং জীবনধারা হুমকির সম্মুখীন; মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলো পশ্চিমা 'ক্রুসেডারদের' এবং হিন্দু 'দখলদারদের' পুতুল; এবং ব্যক্তি ইসলামবিরোধী, কলুষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার মধ্যে জিম্মি।

সংকটের এই ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে জিহাদিরা সংকটের সমাধান সম্পর্কে বলে : শুধু শরিয়াহভিত্তিক ইসলামিক রাষ্ট্র নির্মাণই এই সব সংকটের সমাধান দিতে পারে এবং এটি প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিমদের সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নিতে হবে। এই যুক্তিতে জিহাদিরা সশস্ত্র জিহাদকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করার অবকাশ পায় এবং চলমান সংকটের একমাত্র সমাধান বলে উল্লেখ করে। এমনকি বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করাও যেতে পারে, যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশি জিহাদিদের বয়ান অনুসারে, বৈশ্বিক 'ক্রুসেডার' শত্রুদের পাশাপাশি ভারত আঞ্চলিক প্রতিপক্ষ বা স্থানীয় 'অন্যান্য' হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃহৎ ও প্রভাবশালী এই প্রতিবেশীর রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের অনেক অংশের মধ্যে 'ভারতবিরোধী' মনোভাবকে উসকে দেয়। স্থানীয় এই প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে আইএস এবং তার স্থানীয় দোসররা শক্তিশালী আঞ্চলিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এ ছাড়া আরেকটি উদ্বেগজনক প্রবণতা হলো আইএসের সমাজের সচ্ছল এবং হতদরিদ্র উভয় শ্রেণি থেকে দলভুক্তকরণের সক্ষমতা। সম্প্রতি গ্রেপ্তার ও নিহতদের জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ছোট ছোট হামলাগুলোতে ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উভয় থেকে আসা তরুণেরা জড়িত ছিল।[১০৬] অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মর্যাদানির্বিশেষে এই অভিনব সমতায়ন বাংলাদেশি জিহাদি মতাদর্শ প্রচারকদের দলভুক্তকরণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলের শক্তিমত্তা নির্দেশ করে।

তা ছাড়া গোষ্ঠীটির শীর্ষ নেতারা নিহত ও গ্রেপ্তার হওয়ার পর বাংলাদেশে আইএস-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতা কতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, তা এখনো সুস্পষ্ট নয়। অতিসম্প্রতি, বাংলার আইএসের আমির সাইফুল্লাহ ওজাকি ইরাকের সুলাইমানিয়াহ নামক কুর্দিস্তান শহরে অবস্থিত কারাগারে রয়েছেন বলে জানা গেছে। তিনি ২০১৯ সালের মার্চে সিটিজির (কুর্দিস্তান সন্ত্রাস দমন গোষ্ঠী/কুর্দিস্তান কাউন্টার টেররিজম গ্রুপ) কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন বলে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে।[১০৭] আইএসের সর্বশেষ গুপ্ত ঘাঁটি বাগুজের পতনের পর আরও ৯

বাংলাদেশি জিহাদি হয় আত্মসমর্পণ করেছে অথবা গ্রেপ্তার হয়েছে বলে জানা গেছে।[১০৮] সামরিক এবং গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের প্রধান তামিম আহমেদ চৌধুরী, সারোয়ার জাহানসহ বাংলাদেশে আইএস-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা আইন প্রয়োগকারীদের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' নিহত অথবা গ্রেপ্তার হয়েছে।[১০৯] সর্বোপরি, আবু মোহাম্মদ আল বাঙালি নামধারী অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির নেতৃত্বে গোষ্ঠীটি আবার সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে বলে গত বছর পুলিশের তল্লাশিচৌকিতে হামলার পর জানা গেছে।[১১০] প্রধান নেতারা নিহত ও গ্রেপ্তারের পর বাংলাদেশের আইএস-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীটির সাংগঠনিক শক্তিমত্তা দৃশ্যত হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য এই নিয়ে তুষ্ট হওয়া অনুচিত হবে, কারণ, সাম্প্রতিক ঘটনা-পরিক্রমা হতে কেন্দ্রীয় আইএসের সাংগঠনিক পুনর্গঠনের সঙ্গে কৌশল ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—তার মধ্যে অন্যতম স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়াকে অন্যতম রণক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা।

প্রবন্ধটি এর আগে ইংরেজিতে *পারস্পেকটিভ অন টেররিজম* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদে সহায়তা করার জন্য ফজলে রাব্বীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তথ্যসূত্র

১. Saimum Parvez, 'Explaining Political Violence in Contemporary Bangladesh.' In Ali Riaz, Zobaida Nasreen and Fahmida Zaman (eds.), *Political Violence in South Asia*, (Abingdon : Routledge, 2018), p. 54.

২. Colin P. Clarke, 'What Does the Islamic State's Organisational Restructuring Tell Us?,' *International Centre for Counter-Terrorism—The Hague*, 3 June 2019. Online at : https ://icct.nl/publication/what-does-the-islamic-states-organisational-restructuring-tell-us/.

৩. See Colin P. Clarke, op. cit., also Mina al-Lami, 'Analysis : Will disillusionment with the IS 'caliphate' prevent its revival?,' *BBC Monitoring*, March 5, 2019. Online at : https ://monitoring.bbc.co.uk/product/c200ntjp.

৪. Fayaz Bukhari and Alasdair Pal, 'Islamic State claims 'province' in India for first time after clash in Kashmir,' *Reuters*, May 11, 2019. Online at : https ://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-islamic-state/islamic-state-claims-province-in-india-for-first-time-after-clash-in-kashmir-idUSKCN1SH08J.

৫. Ben Hubbard, 'ISIS mysterious leader is not dead, new video shows,' *New York Times*, April 29, 2019. Online at : https ://www. nytimes.com/2019/04/29/world/middleeast/isis-baghdadi-video.html.

৬. SITE Intelligence, 'IS' Amaq Reports IS Bombing on Bangladeshi Forces in Sylhet', *Jihadist News*, March 25, 2017. Online at :

https ://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/is-amaq-reports-is-bombing-on-bangladeshi-forces-in-sylhet.html; also see Monideepa Banerjie, '6 Killed, 50 Injured In Twin Blasts In Bangladesh's Sylhet. Anti-Terror Operation Under Way,' *NDTV*, March 26, 2017. Online at : https ://www.ndtv.com/world-news/bangladesh-launches-operation-twilight-to-capture-terrorists-in-sylhet-1673573.

৭. Nuruzzaman Labu, 'Militants trying to regroup, police are the targets,' *Bangla Tribune*, July 25, 2019. Online at : http ://en.banglatribune.com/others/news/62409/Militants-trying-to-regroup-police-are-the.

৮. Dipanjan Roy Chaudhury, 'Bangladesh on high alert after ISIS threat,' *The Economic Times*, April 29, 2019. Online at : https ://economictimes.indiatimes.com/news/defence/bangladesh-on-high-alert-after-isis-threat/articleshow/69102511.cms.

৯. Bangla Tribune Desk, 'IS claims bombing attempt at police checkpoints in Dhaka,' *Bangla Tribune*, July 25 2019. Online at : http ://en.banglatribune.com/others/news/62433/IS-claims-bomb-plantings-at-two-police-checkpoints; Arifur Rahman Rabbi and Aminul Islam Babu, 'Blast in Gulistan injures 3 policeman,' April 30, 2019, *Dhaka Tribune*. Online at *:* https ://www.dhaka-tribune.com/ bangladesh/dhaka/2019/04/30/blast-in-gulistan-injures-3-cops-is-claims-attack; Abdullah Alif, Malibagh blast : Explosive likely planted in police van from before, *Dhaka Tribune*, May 27, 2019. Online at : https ://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2019/05/27/malibagh-blast-explosive-likely-planted-in-police-vehicle.

১০. C. Christine Fair, Ali Hamza and Rebecca Heller, 'Popular support for Suicide Terrorism in Bangladesh : Worse than you think,' *Lawfare*, September 4, 2016. Online at : https ://www.lawfareblog.com/popular-support-suicide-terrorism-bangladesh-worse-you-think#.

১১. Google Scholar and SCOPUS searches reveal an absence of research articles on the role of Islamic State in Bangladesh. However, some studies look at the development of jihadist organisations in general and discuss Islamic State operations on a limited scale. Please see Ali Riaz and Saimum Parvez, 'Bangladeshi Militants : What do We Know?' *Terrorism and Political Violence.* Volume 30, 2018-Issue 6 and Shahab Enam Khan, 'Bangladesh : The Changing Dynamics of Violent Extremism and the Response of the State,' *Small Wars & Insurgencies*, 28 :1, 191-217, 2017. Before the emergence of IS and AQIS affiliated groups in Bangladesh, Zayadul Ahsan and Pavitra Banavar discussed about local violent extremist groups, including Jamaatul Mujahideen Bangladesh (JMB) and Harkat-ul-Jihad Bangladesh (HuJIB), see Zayadul Ahsan and Pavitra Banavar, 'Who Are the Militants?' In : Riaz, A. and Fair, C. C. (eds.), *Political Islam and*

Governance in Bangladesh, (New York : Routledge, 2011). Also, a Sweden-based Bangladeshi journalist's blog *People, Power, and States* published two posts on Bangladeshi foreign fighters in Syria. Online at : https ://tasneemkhalil.com/meet-the-ameer-of-isis-in-bangladesh-2dab494c4d6e; Several Bangladeshi and international news agencies published news stories on the terrorist outfit. However, most of the local newspaper either named the group Neo-JMB, following the government's directive, or presented the group as 'allegedly linked with IS'.

১২. Carol Christine Fair and Seth Oldmixon, 'Think again : Islamism and Militancy in Bangladesh,' *The National Interest*, August 13, 2015. Online at : https ://nationalinterest.org/feature/think-again-islamism-militancy-bangladesh-13567.

১৩. Molly Patterson and Kristen Renwick Monroe, 'Narrative in Political Science,' *Annual Review of Political Science* 1, no. 1 (1998) : 315-31; Francesca Polletta, 'Contending Stories : Narrative in Social Movements.' *Qualitative Sociology* 21, no. 4 (1998), pp. 419-446.

১৪. Steven R. Corman, 'Understanding the Role of Narrative in Extremist Strategic Communication', in Laurie Fenstermacher and Todd Leventhal (Eds.), *Countering Violent Extremism : Scientific Methods and Strategies* (Washington, DC : NSI Inc., September 2011), p. 36.

১৫. Nathan C. Funk and Abdul Aziz Said, 'Islam and the West : narratives of conflict and conflict transformation,' *International Journal of Peace Studies* 9, no. 1 (2004), pp. 1-28; Yasmin Ibrahim, '9/11 as a new temporal phase for Islam : the narrative and temporal framing of Islam in crisis,' *Contemporary Islam*, 1 no.1 (2007), 37-51; Rane Halim, 'Narratives and counter-narratives of Islamist extremism,' In : Anne Aly, Stuart Macdonald, Lee Jarvis and Thomas Chen, eds. *Violent Extremism Online : New Perspectives on Terrorism and the Internet*, (London : Routledge, 2016), pp. 167-186.

১৬. Manuel R. Torres-Soriano, 'The road to media Jihad : the propaganda actions of Al Qaeda in the Islamic Maghreb,' *Terrorism and Political Violence*, 23,1(2010), pp. 72-88; Paul R. Baines and Nicholas J. O'Shaughnessy, 'Al-Qaeda messaging evolution and positioning, 1998-2008 : propaganda analysis revisited,' *Public Relations Inquiry* 3, no. 2 (2014), pp. 163-191.

১৭. Jeffry R. Halverson, H. L. Goodall Jr and Steven R. Corman, *Master Narratives of Islamist Extremism*, (New York, NY : Palgrave Macmillan, 2011).

১৮. Samantha Mahood and Halim Rane, 'Islamist narratives in ISIS recruitment propaganda,' *The Journal of International Communication*, 23 :1 (2017), pp.15-35.

১৯. Charlie Winter, 'Documenting the Virtual 'Caliphate',', *Quilliam Foundation*, October 2015.

২০. Daveed Gartenstein-Ross, Nathaniel Barr and Bridget Moreng, 'The Islamic State's Global Propaganda Strategy,' *ICCT Research Paper*, March 2016.

২১. J.M. Berger, *Extremism* [The MIT Press Essential Knowledge Series] (Cambridge, MA : MIT Press, 2018) : p.99; Mohammed M. Hafez, 'Martyrdom Mythology in Iraq : How Jihadists Frame Suicide Terrorism in Videos and Biographies,' *Terrorism and Political Violence* 19, no.1 (2007), pp. 95-115.

২২. Haroro J. Ingram, 'Deciphering the Siren Call of Militant Islamist Propaganda : Meaning, Credibility & Behavioural Change,' *ICCT Research Paper*, 2016.

২৩. Mohammed M. Hafez, op. cit.

২৪. Haroro J. Ingram, op.cit., p. 15.

২৫. Alex P. Schmid, 'Al-Qaeda's 'Single Narrative' and Attempts to Develop Counter-Narratives : The State of Knowledge,' *ICCT Research Paper*, January 2014. Online at : https ://www.icct.nl/download/file/Schmid-Al-Qaeda's-Single-Narrative-and-Attempts-to-Develop-Counter-Narratives-January-2014.pdf.

২৬. Tribune Desk, 'New Islamic State video features Gulshan attackers,' *The Dhaka Tribune*, September 24th, 2016. Online at : https ://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2016/09/24/new-islamic-state-video-features-gulshan-attackers/.

২৭. Tipu Sultan, 'IS ideologues come up with extreme atrocities,' *Prothom Alo*, August 7, 2016.

২৮. Siddharthya Roy, 'A Year of Bangladesh's War on Terror,' *The Diplomat*, July 6, 2017. Online at : https ://thediplomat. com/2017/07/a-year-of-bangladeshs-war-on-terror/.

২৯. Ellen Barry, 'Bangladesh Pushes Back as Warnings of ISIS Expansion Gather Steam,' *New York Times*, October 30, 2015. Online at : https ://www.nytimes. com/2015/10/31/world/asia/bangladesh-isis-terrorism-warnings.html; 'Bangladesh skeptical of claims that ISIS was behind shootings of foreigners,' *New York Times*, October 4, 2015. Online at : https ://www.nytimes. com/2015/10/05/world/asia/bangladesh-skeptical-of-claims-that-isis-was-behind-shootings-of-foreigners.html.

৩০. Mohammad Al-Masum Molla, 'BNP : PM's statement unexpected,' *Dhaka Tribune*, October 4, 2015 : https ://www.dhakatribune.com/uncategorized/2015/10/04/bnp-pms-statement-unexpected.

৩১. *Dabiq*, 'Just terror,' Issue 12, 1437 Safar, p. 41. Online at : https ://jihadology.net/?s=Dabiq+issue+12.

৩২. *Dabiq*, Issue 12, op. cit., p.41.

৩৩. Ibid.

৩৪. Zayadul Ahsan, 'Dhaka-Syria-Dhaka,' February 3, 2017, *The Daily Star*. Online at : https ://www.thedailystar.net/frontpage/dhaka-syria-dhaka-1355287.

৩৫. *Dabiq*, Issue 12 & 14.

৩৬. Matteo Besana, 'Bangladesh : Islamic State Province or Battlefield of Words?,' *International Centre for Counter-terrorism—The Hague*, 5 October 2016. Online at : https ://icct.nl/publication/bangladesh-islamic-state-province-or-battlefield-of-words/.

৩৭. The Republic of Dagestan is a federal subject of Russia. It is located in the North Caucasus region neighbouring Chechnya, Georgia and Azerbaijan.

৩৮. It has been observed that the videos produced by IS are published by *Bengal Bilad* media office. Also, IS' online magazine *Dabiq* publishes a list of featured attacks; the attacks occurred in Bangladesh are mentioned as attacks in 'Bengal', not in the Wilayat of Bengal.

৩৯. Matteo Besana, op. cit.

৪০. *BBC*, 'Al-Qaeda chief Zawahiri launches al-Qaeda in South Asia,' *BBC Asia*, 4 September 2014. Online at : https ://www.bbc. com/news/world-asia-29056668.

৪১. Tasneem Khalil, 'Meet the mastermind of the Holey attack,' Dhaka Tribune, July 25, 2017. Online at : https ://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2017/07/25/holey-attack-mastermind. For more on Tamim Chowdhury, please see Amarnath Amarasingam, 'Searching for the Shadowy Canadian Leader of ISIS in Bangladesh,' Jihadology, August 2, 2016. Online at : https ://jihadology.net/?s=tamim+chowdhury

৪২. Tasneem Khalil, op. cit.

৪৩. Tribune Desk, 'Tamim Chowdhury featured in new IS publication,' *Dhaka Tribune*, October 5, 2016. Online at : https ://www. dhakatribune.com/bangladesh/crime/2016/10/05/tamim-chowdhury-featured-new-publication/.

৪৪. Nuruzzaman Labu, 'Is new JMB an ideological affiliate of Islamic State?', *Dhaka Tribune*, July 25, 2017. Online at : https ://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2017/07/25/new-jmb-ideological-affiliate-islamic-state/.

৪৫. *Dabiq*, Issue 12, op. cit., p. 39.

৪৬. Ibdid., p. 41.

৪৭. Ahmed Zayeef, 'Saifullah Ozaki in Iraqi Jail,' *Prothom Alo*, May 20, 2019. Online at : https ://en.prothomalo.com/bangladesh/news/195888/Militant-Saifullah-Ozaki-in-Iraqi-jail.

৪৮. Nuruzzaman Labu, 'How many Bangladeshis have joined IS?,' *Dhaka Tribune*, June 28, 2017. Online at : https ://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2017/06/28/many-bangladeshis-joined/.

৪৯. United Nations Office on Drugs and Crime, 'Investigation, Prosecution and Adjudication of Foreign Terrorist Fighter Cases for South and South-East Asia',

UN Office in Vienna, Austria, 2018. Online at : https ://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_Fighters_Asia_Ebook.pdf.

৫০. Zayadul Ahsan, 'Militants grow in silence,' *The Daily Star*, June 7, 2016. Online at : https ://www.thedailystar.net/frontpage/militants-grow-silence-1235527.

৫১. Tasneem Khalil, op. cit.

৫২. Ibid.

৫৩. Ibid.

৫৪. 'IS computer hacker Siful Haque Sujan killed in air strike,' *BBC*, 31 December 2015 : https ://www.bbc.com/news/uk-wales-35206038.

৫৫. See, 'Ex-Ritsumeikan teacher, a suspect in 2016 Dhaka terror attack fatal to 22, held in Iraq,' *Japan Times*, *May 21, 2019*. Online at : https ://www.japantimes.co.jp/news/2019/05/21/national/crime-legal/ex-ritsumeikan-teacher-suspect-2016-dhaka-terror-attack-fatal-22-held-iraq/#. XTW8l5MzZN0.

৫৬. Nuruzzaman Labu, 'Is New JMB an ideological affiliate of Islamic State?,' op. cit.

৫৭. Ibid.

৫৮. Ibid.

৫৯. Zayadul Ahsan, 'Militants grow in silence,' op. cit.

৬০. Nuruzzaman Labu, 'Is New JMB an ideological affiliate of Islamic State?' op. cit.

৬১. Dhaka caf attack ends with 20 hostages among dead', *The Guardian*, July 3, 2016. Online at : https ://www.theguardian.com/world/2016/jul/01/dhaka-bangladesh-restaurant-attack-hostages.

৬২. *Dabiq*, Issue 12, op. cit., p. 40

৬৩. Ali Riaz and Saimum Parvez, 'Bangladeshi Militants : What do We Know?' *Terrorism and Political Violence* 30, Issue 6 (2018) : 10.

৬৪. Ali Riaz and Saimum Parvez, op. cit., 8-13

৬৫. Zayadul Ahsan, 'Militants grow in silence,' op. cit.

৬৬. *Dabiq*, Issue 12, op. cit. p. 40.

৬৭. See the Oxford Dictionary of Islam, available at Oxford Islamic Studies Online at : http ://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2301.

৬৮. SITE Intelligence Group, Bangladeshi IS Fighters in Raqqah commend Gulshan Attackers in video, Threaten more operations to come, July 5, 2016. Online at : https ://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/bangladeshi-is-fighters-in-raqqah-commend-gulshan-attackers-in-video-threaten-more-operations-to-come.html.

৬৯. SITE Intelligence Group, op. cit.

৭০. Ibid.

৭১. *Dabiq*, 'The Murtadd Brotherhood,' Issue 14, 1437 Rajab, p. 61. Online at : https ://jihadology.net/2016/04/13/new-issue-of-the-islamic-states-magazine-dabiq-14/.

৭২. *Dabiq*, Issue 12, op. cit. p. 39.

৭৩. Ibid., p. 38.

৭৪. *Dabiq*, Issue 14, op. cit. p. 61.

৭৫. Ibid., p. 60.

৭৬. SITE Intelligence Group, op. cit.

৭৭. SITE Intelligence Group, op. cit.

৭৮. 'Interview with the Amir of the Khilafah's Soldiers in Bengal Shaykh Abu Ibrahim Al-Hanif,' *Dabiq* 14, *The Murtadd Brotherhood*, 1437, Rajab, p. 64. Online at : https ://jihadology.net/2016/04/13/new-issue-of-the-islamic-states-magazine-dabiq-14/.

৭৯. *Dabiq*, Issue 14, op. cit., p. 64

৮০. *Dabiq*, Issue 14, op. cit., p. 65

৮১. Ali Riaz and Saimum Parvez, op. cit. p. 13

৮২. Quintan Wiktorowicz, Radical Islam Rising : Muslim Extremism in the West (New York : Rowman and Littlefield, 2005); Also see Rohan Gunaratna, Arie W. Kruglanski, Michele J. Gelfand, Jocelyn J. Blanger, Anna Sheveland and Malkanthi Hetiarachchi. 'The Psychology of Radicalization and Deradicalization : How Significance Quest Impacts Violent Extremism.' *Advances in Political Psychology* 35 (2014), pp. 69-93.

৮৩. *Rumiyah*, Issue 2, op. cit., p. 10.

৮৪. *Dabiq*, Issue 14, op. cit., p. 63.

৮৫. Ibid., p. 63.

৮৬. SITE Intelligence Group, op.cit.

৮৭. *Dabiq*, Issue 14, op. cit., p. 65.

৮৮. Tribune Desk, 'New Islamic State video features Gulshan Attackers,' *Dhaka Tribune*, September 24, 2016. Online at : https ://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2016/09/24/new-islamic-state-video-features-gulshan-attackers/.

৮৯. Tribune Desk, 'New Islamic State video features Gulshan Attackers,' op. cit.

৯০. See Tahmid Shafi's video statement, available at SITE Intelligence Group, op.cit.

৯১. Mohammed M. Hafez, op. cit.

৯২. Robert Pape, *Dying to Win : The Strategic Logic of Suicide Terror* (New York : Random House, 2005).

৯৩. *Dabiq*, issue 14, op. cit., p. 65-66.

৯৪. *Dabiq*, issue 12, op. cit., p 41.

৯৫. Ibid., p 41.

৯৬. See *Rumiyah*, Issue 2, 'The Shuhada of the Gulshan attacks,', Muharram 1438, p. 9. Online at : http ://clarionproject.org/wp-content/uploads/Rumiyh-ISIS-Magazine-2nd-issue.pdf.

৯৭. *Rumiyah*, Issue 2, op. cit., p. 9.

৯৮. *Rumiyah*, Issue 1, 'The Kafir's Blood Is Halal for You, So Shed It,' pp. 34-36.

৯৯. See Arafat Hossain Tushar's video statement at SITE Intelligence Group, op. cit.

১০০. *Rumiyah*, Issue 2, op. cit., pp. 8-11.

১০১. Ibid.

১০২. Ibid.

১০৩. Edward Malnick, 'Mohammed Emwazi timeline : from school years with Tulisa Contostavlos to becoming Jihadi John,' *Telegraph*, February 26, 2015. Online at : https ://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11438747/Mohammed-Emwazi-timeline-from-school-years-with-Tulisa-Contostavlos-to-becoming-Jihadi-John.html.

১০৪. *Rumiyah*, Issue 2, op. cit., p. 10.

১০৫. See video statement of Arafat Hossain Tushar, available at SITE Intelligence Group, op.cit.

১০৬. Ali Riaz and Saimum Parvez, op. cit., p. 6.

১০৭. Ahmed Zayeef, 'Saifullah Ozaki in Iraqi jail,' op. cit.

১০৮. Ahmed Zayeef, 'Saifullah Ozaki in Iraqi jail,' op. cit.

১০৯. Star Online Report, 'N'ganj Raid : 3 among Dhaka attack mastermind Tamim Killed,' The Daily Star, August 27, 2016. Online at : https ://www.thedailystar.net/country/cops-cordon-suspected-militant-den-narayanganj-1276288.

১১০. Nuruzzaman Labu, 'Militants trying to regroup, police are the targets,' *Bangla Tribune*, July 25, 2019. Online at : http ://en.banglatribune.com/others/news/62409/Militants-trying-to-regroup-police-are-the.

বই আলোচনা

প্যানডেমিক—জিজেকের দ্রুত ও উত্তেজক ব্যাখ্যা

সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ

প্যানডেমিক শব্দটার সঙ্গে গোটা দুনিয়া এখন বিশেষভাবে পরিচিত। এর আগের কয়েক দশকে জলবায়ু বিপর্যয়, অর্থনীতিতে মন্দার মতো বিষয় নিয়ে গোটা দুনিয়া বিচলিত থাকলেও মানুষের ইতিহাসে—অন্তত কৃষিবিপ্লবের পর—সবচেয়ে বড় শত্রু জীবাণুর আক্রমণ আর এর আঘাতে তছনছ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আবার ফিরিয়ে এনেছে কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাস। প্যানডেমিক ব্যাপারটা গত কয়েক হাজার বছরে মানুষের সমাজে পরিবর্তনকামী হিসেবে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। প্রতিবারই অজস্র প্রাণ কেড়ে নেওয়ার পর নতুন এক দুনিয়া রেখে গেছে। অনেক সময় সেই দুনিয়ায় পুরোনোর কোনো নিশানা টিকে ছিল না, আবার কখনো বন্যার পর পলিমাটি যেমন নতুন উর্বরা ভূমির জন্ম দেয়, তেমনি এই প্যানডেমিক বা অতিমারি মানুষের প্রগতিতে নতুন সম্ভাবনার বীজ বুনে দিয়ে গেছে।

তবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে এ থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। আর আগের ঘটনা বিশ্লেষণ করাটা যতটা সহজ, মানুষের সমাজের ভবিষ্যৎ গতিপথের আভাস দেওয়া ততটাই কঠিন। এই কাজ করতে গেলে প্রায়ই নিজেকে বেকুব হিসেবে পরিগণিত করার সুযোগ দেওয়া হয়। মানুষের সমাজে গতিপথ এত সব অবিশ্বাস্য, অনুমানের অযোগ্য পথ বেছে নিয়েছে যে এই পূর্বাভাসের সাহস করা তাই একধরনের ‘বালখিল্য’ সাহসের ব্যাপার।

এই আলাপগুলো দার্শনিক জর্জ উইলহেম ফ্রেডরিখ হেগেল হরেদরে বলে গেছেন। কিন্তু হেগেলের একজন ভাবশিষ্য হয়েও আধুনিক যুগের দার্শনিক স্লাভয় জিজেক এই পূর্বাভাস করার ব্যাপারে কোনো রকম দ্বিধা করেননি। আগের সব প্যানডেমিকের চেয়ে বর্তমানে প্রবল প্রতাপে বিরাজ করা করোনা অতিমারি অনেক দিক দিয়েই জটিল। প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে বিশ্বায়ন। এই করোনা এমন এক

সময় দুনিয়ায় এল, যখন পুরো দুনিয়ায় 'কানেক্টেড'। বাংলাদেশের ভূরুঙ্গামারীতে বসে এক ক্লিক করলে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে একলহমায় বার্তা পৌঁছে যায়। কেরানীগঞ্জের ঘিঞ্জি কারখানায় উৎপাদিত গার্মেন্ট পণ্য দিয়ে ইউরোপের দামি ব্র্যান্ডগুলো বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে। বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের কোথাও অতিমারি দেখা দিলে তাই সেটা ছড়িয়ে যাবে এই ধরণির কোনায় কোনায়। এর ফলে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠা অর্থনীতি, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, জীবনাচার আর এদের মিথস্ক্রিয়া কী রকম হবে, সেটা বলা অসম্ভবই বটে।

তবু ৭১ বছর বয়সী 'রকস্টার ফিলোসফার' জিজেক সবার আগে এই বিষয়ে একটি বই লিখে ফেলেন মার্চের শেষ দিকে। স্বভাবতই এই বইয়ে জিজেকীয় তাড়াহুড়া, অন্যদের চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনের চেষ্টা, হেগেল ছাড়াও লাকা, মার্ক্স, ফুকোর লেন্স দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা এবং 'নিও-কমিউনিজম' নিয়ে জিজেকের ধারণা ফুটে ওঠে। করোনার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ার পর নিজের লেখা কিছু কলাম এবং আরও কিছু ব্যাপার যোগ করে (পরবর্তী সংস্করণে আরও একটি অধ্যায় যোগ করে) জিজেক শ খানেক পাতার বইটি রচনা করেন।

জিজেকের বেশ কিছু পূর্বাভাস বিগত কয়েক মাসে পুরোপুরি সঠিক প্রমাণিত না হলেও এই বইয়ের আলাপগুলো জরুরি। আর প্যানডেমিকের পর বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত কোনো মনীষীর প্রথম বই হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ।

মোট ১০টি (পরবর্তী সংস্করণে আরও একটি) ছোট ছোট অধ্যায়ে ভাগ করা বইটিতে চমক এবং গতি দুর্দান্ত। ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসে জিজেক অতটা সফল না হলেও ইতিহাস আর দার্শনিক উদাহরণে দুর্দান্ত।

যেমন পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'এপিডেমিকের পাঁচটি স্তর'। এই অধ্যায়ে জিজেক উল্লেখ করেন এলিজাবেথ কুবলার রসের 'ডেথ অ্যান্ড ডাইং' রচনাটির কথা, যেখানে লেখিকা দেখান যে নিশ্চিত মৃত্যু হবে, এমন অসুখ হলে মানুষ কী রকম আচরণ করে, সেটির পাঁচটি ধাপ। প্রথম ধাপ অস্বীকার (না, না, আমার এই রোগ হতেই পারে না); যখন কোনোভাবেই আর অস্বীকার করা যায় না, তখন আসে রাগ (আমার এই জিনিস কীভাবে হলো); তৃতীয় ধাপে আসে দর-কষাকষি (আর কিছুদিন নিশ্চয়ই টিকে থাকতে পারব, নাতনিটার বিয়ে না দেখে মরি কেমনে?); এরপর আসে ডিপ্রেশন (জিজেকের ভাষায় লিবিডিনাল ডিসইনভেস্টমেন্ট : আমি তো মরেই যাচ্ছি, এখন যা খুশি হোক, আমি থোড়াই কেয়ার করি); আর শেষ ধাপে আসে মেনে নেওয়া (আমি এর সঙ্গে লড়াই করে পারব না, তা সে যতই প্রস্তুতি নিই না কেন)। কুবলার রস এই তত্ত্বের প্রয়োগ করেন অন্য বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিপর্যয়, যেমন চাকরি হারানো, কাছের কাউকে হারানো, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি ঘটনাতেও। আর জিজেক এ ব্যাপারটা প্রয়োগ করেন বিশ্বের বড় বড় ঘটনায়।

যেমন জলবায়ু বিপর্যয়ের বেলায় প্রথমে আমরা অস্বীকার করি (একে পরিবেশের স্বাভাবিক ঘটনা বলে); এরপর আসে রাগ (সেই সব বড় বড় কোম্পানির প্রতি, যারা পরিবেশদূষণের মূল হোতা, আর সরকারগুলো, যারা একে উপেক্ষা করেছিল); এরপরের ধাপে আসে দর-কষাকষি (প্লাস্টিক ব্যবহার কমালে, রিসাইকেল করলে আমরা আরও কিছুদিন একে ঠেকিয়ে রাখতে পারব, কিংবা এইভাবে ভাবা যে বরফ গলে সাগর তৈরি হওয়ায় আমাদের বাণিজ্য জাহাজগুলোর সুবিধা হবে, সাইবেরিয়ায় চাষযোগ্য ভূমি জেগে উঠবে); আর শেষ ধাপে মেনে নিয়ে অবশেষে মানুষ বলে যে এই জলবায়ু বিপর্যয় এক বড় ঝুঁকি, একে থামাতে আমাদের পুরো সিস্টেমকে ঢেলে সাজাতে হবে।

একই ঘটনা, তথা ধাপের পর ধাপ ঘটে আমাদের ডিজিটাল জীবন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে। প্রথমে বলা হয়, এগুলো অতিকথন; এরপর বড় কোম্পানিগুলোর ওপর রাগ, এরপর এই ভেবে সান্ত্বনা দেওয়া যে আরে! আমি তো আর জঙ্গিবাদী না, আমার কিসের ভয়; এরপর আসে ডিপ্রেশন, হায়, সব শেষ! আমার সব ব্যক্তিস্বাধীনতা শেষ; আর শেষ ধাপে এই ব্যাপারটা মেনে নিয়ে একে কীভাবে রোখা যায়, সেই চেষ্টা করা।

অবধারিতভাবে, অতিমারির বেলাতেও একই ব্যাপার ঘটে। আগের যুগে প্লেগ বা মহামারি শুরু হলে শুরুতে অস্বীকার; এরপর রাগ (এই পর্যায়ে পাপী খোঁজা হতো, যাদের কারণে সৃষ্টিকর্তা খেপে গিয়ে এই রোগ পাঠিয়েছেন। এর ফলে চলত উইচ হান্ট। মধ্যযুগে ইউরোপে আমরা এই পর্যায়ে ব্যাপক উইচ হান্ট দেখি, যার শিকার হতো ইহুদি, নারী এবং ভিন্ন জাতির লোকজন); এরপর হায় হায়, সব শেষ বলে আর্তনাদ; এরপরের ধাপে, যেহেতু সব গেছেই, এবার তাহলে জন্মের ফুর্তি করে নিই, অবাধ মদ্যপান আর যৌনাচার করি (জিওভান্নি বোকাচ্চিওর *দেকারমন*-এ এর উদাহরণ পাওয়া যায়); আর শেষে একে মেনে নিয়ে এর প্রতিকারে ব্যবস্থা নেওয়া।

আশ্চর্যজনকভাবে এই আধুনিক যুগেও এর ব্যত্যয় হয়নি। শুরুতে অস্বীকার (আরে, এগুলো গুজব, এগুলো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই); এরপরে রাগ—এই পর্যায়ে মূলত চলে জাতিগত বিদ্বেষ (চীনারা সাপ-ব্যাঙ খায় বলে এগুলো হয়েছে, ইতালি থেকে আক্রান্ত লোকগুলো দেশে এসে এগুলো ছড়িয়েছে, এটা বড় বড় কোম্পানির ওষুধ বেচার ধান্দায় ল্যাবরেটরি থেকে ছড়ানো হয়েছে কিংবা এই সবই বিল গেটস আর দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্র মিলে করছে, যাতে আরও বেশি করে কন্ট্রোল নেওয়া যায়); এরপর আসে দর-কষাকষি (গরমের দেশে মনে হয় এত ছড়াবে না, আমাদের শরীরে ইমিউনিটি বেশি, এর ফলে বিশ্ববাণিজ্যে আমাদের আরও সুবিধা হবে); এরপরের ধাপে ডিপ্রেশন (হায় হায়, সব শেষ, আমরা কেউ বাঁচব না);

আর শেষ ধাপে মেনে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া (কোয়ারেন্টিন, টেস্ট, ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা)।

পুরো বইয়ে সম্ভবত এই অধ্যায়টিতেই জিজেক একেবারে সঠিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এরপর এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অবস্থা দেখিয়েছেন। এর ফলে পাঠকও ব্যাপারটাকে নিজ দেশের সঙ্গে তুলনা করতে পারবেন।

লাকা আর হেগেলের অনুসারী জিজেক সিনেমার বিশ্লেষণ, বিশেষত সাইকো-অ্যানালাইসিসের জন্য বিখ্যাত। এই ছোট বইটাতেও তিনি নিজের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন। জিজেকের অন্যতম প্রিয় পরিচালক এবং কতকটা তাঁর মতোই একসেন্ট্রিক কুয়েন্টিন টারান্টিনোর *কিল বিল*-২-এর চরম আঘাতের মেটাফরের সঙ্গে করোনার আঘাতের তুলনা এনেছেন। পূর্ব এশিয়ার কিংবদন্তি এই 'পাঁচ পাঞ্জার আঘাত'-এর উদাহরণ এনে তিনি করোনায় কীভাবে প্রচলিত সিস্টেম ধসে পড়বে, সেই পূর্বাভাস দিয়েছেন।

বিশেষত জিজেকের আক্রোশ বেশি ছিল চীনের দিকে। নামে কমিউনিস্ট হলেও চীন যে আদতে চেয়ারম্যান মাওয়ের আদর্শের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয়েছে এবং মাওবাদীরাই চীনে সবচেয়ে বেশি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ঝুঁকিতে আছেন, এই আপাতফ্যালাসির আলাপে জিজেক ধারণা করেন, করোনায় চীনের এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এবং চীনসহ নানা দেশে 'নব-কমিউনিজমের' উত্থান হবে।

এই আপাত-ডায়ালেকটিকের আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়েই জিজেক বেশ আকর্ষণীয় কায়দায় বইটা শুরু করেন। বইয়ের প্রথম শব্দই ছিল বাইবেলের বাণী—'নোলি মি ট্যানজেরে'—আমাকে ছুঁয়ো না। খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের পর ম্যারি ম্যাগডালেন শব্দগুলো বলেন যিশুকে। নিজেকে নিষ্ঠাবান 'খ্রিষ্টান নাস্তিক' পরিচয় দেওয়া জিজেক এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, না ছুঁয়ে যিশুকে যেমন আরও বেশি করে কাছে পাওয়ার, আরও বেশি নৈকট্যের সুযোগ চলে আসে বলে বাইবেলে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তেমনি করোনার এই সময়ে 'সোশ্যাল ডিস্টেনসিং' মানুষকে আদতে আরও কাছে আনবে বলেই তিনি মনে করেন। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'নয়নসম্মুখে তুমি নাই,/ নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'-এর মতো, দীর্ঘ সময় না দেখা, কাছে না আসতে পারার ফলে মানুষে মানুষে সম্পর্ক উল্টো আরও গভীর হবে, মানুষ সময় নিয়ে সম্পর্কের গুরুত্ব দিতে শিখবে—এই আশাই করেন জিজেক। ধার করেন গুরু হেগেলের একাধিক মন্তব্য।

এরই ধারাবাহিকতায় তিনি মনে করেন, আমরা এখন একই নৌকার যাত্রী। নুহের নৌকা যেমন মহাপ্রলয়ের সময় নতুন দুনিয়ায় তরি ভিড়িয়েছিল, তেমনি আমাদেরও একমাত্র উপায় সবাই এক নৌকায় উঠে বসা। ডায়ালেকটিক প্রিয় জিজেক এই স্থলে অবশ্য বেশ বিভ্রান্ত। রাষ্ট্রীয় কঠোরতার জন্য চীনের ওপর

খড়্গহস্ত হলেও করোনা নিয়ন্ত্রণে এর জরুরতকে তিনি এড়াতে চাননি। যদিও শেষতক অনেকটা স্পষ্ট করেই বলেন যে আসলে মাওয়ের যে নীতি—জনতাকে বিশ্বাস করো—সেটা মেনে চলা হচ্ছে সমাধান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দেখি যে আধুনিক টোটালাটারিয়ান রাষ্ট্রগুলো জনতার কল্যাণ কিংবা উন্নয়নের নানা গল্প দিলেও এবং সময়ে সময়ে জনতাকে দোষী কিংবা ভিকটিম ভাবলেও জনতার প্রতি তাঁদের কোনো রকম বিশ্বাস নেই। এই ব্যাপারটা করোনার মতো বিপর্যয়কে আরও সঙিন করে তোলে।

এর জন্য জিজেক মানুষের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়া মানুষ ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে 'নতুন কমিউনিজম' গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই নতুন ধারায় বাজারের বদলে প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন হবে, ব্যক্তিসম্পদের ওপর অধিকার কমে আসবে এবং সীমিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনীতি পরিচালিত হবে কল্যাণমুখী উপায়ে।

তবে এই স্থলে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ কেমন হবে, শ্রেণিবৈষম্যের ব্যাপারটা কেমন করে মোকাবিলা করা হবে, এ নিয়ে জিজেক খুব একটা স্পষ্ট নন। বরং জিজেকের আশাবাদের বিপরীতে দেখা যায়, গত কয়েক মাসে জেফ বেজোসের সম্পদ আরও বেড়েছে, ধনীরা আরও ধনী হয়েছে, অন্যদিকে দরিদ্ররা নিঃস্ব হয়েছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, উইঘুর, সিরিয়াসহ দুনিয়ার নিপীড়িত জনপদে নিপীড়ন আরও বেড়েছে। রাজনৈতিকভাবে এক নৌকায় থাকার স্বপ্ন দেখলেও মানুষে মানুষে বিভেদ আর বৈষম্য আরও বেড়েছে। অভিবাসী নিয়ে আশার আলাপ থাকলেও বিশ্বব্যাপী অভিবাসী সংকট আরও তীব্র হয়েছে।

তবে জিজেকের দার্শনিক প্রজ্ঞার প্রশংসাও করতে হয়। তিনি পশ্চিমা দর্শনের সদা ব্যস্ত থাকার, সদা তৎপর থাকার এবং অতিরিক্ত পরিমাণে 'পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের' সমালোচনা করেছেন। বোদরিলা আর জেমসনের মতো পোস্টমডার্নিস্ট তাত্ত্বিকদের মতো এর বিপজ্জনক দিক তুলে ধরেছেন। কেন এই ব্যবস্থা চলতে থাকলে, পুঁজিবাদের হাতে সব নিয়ন্ত্রণ থাকলে করোনা বিপর্যয় নতুন দুনিয়াকে আরও বড় নরকের দিকে নিয়ে যাবে, এ নিয়ে স্বভাবসুলভ ডার্ক হিউমার করেছেন। এই জায়গাগুলো উপভোগ্য ও জরুরি।

যেমন তিনি, বই প্রকাশের পর বাড়তি একটি অধ্যায় যোগ করেছেন সামরাহ শহরের এক বাজারের গল্প দিয়ে। কিংবদন্তির সেই গল্পে জানা যায়, সামরাহ শহরের এক দাস একবার বাজারে গিয়ে দেখে, স্বয়ং মৃত্যু সেখানে ঘুরঘুর করছে। ভয়ে সে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসে এবং মালিকের কাছে একটি ঘোড়া চায়, যাতে সে বাগদাদে চলে যেতে পারে মৃত্যুর কাছ থেকে বহুদূরে। দয়ালু মালিক তাকে সবচেয়ে তেজি ঘোড়াটা দেন এবং তাকে বাগদাদে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে হাজির হন

বাজারে। সেখানে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে ভর্ৎসনা করেন তার চাকরকে ভয় দেখানোর জন্য। বিস্মিত মৃত্যু উত্তর দেয় যে, 'আমি তো তোমার দাসকে ভয় দেখাইনি, ওর সঙ্গে আমার আজ সন্ধ্যায় বাগদাদে মোলাকাত হওয়ার কথা।'

এই গল্পের উদাহরণে জিজেক বলেন, করোনা আদতে হয়তো সামরাহ শহরের বাজারে দেখা হওয়া মৃত্যুদূত। আমরা এর ভয়ে বাগদাদ পালাচ্ছি পড়িমরি করে, কিন্তু আদতে সেখানেই সে আমাদের জান কবচ করবে। মানে আমাদের মৃত্যু হবে করোনায় নয়, বরং করোনা-পরবর্তী যে দুনিয়া হবে, সেই দুনিয়ার অর্থনীতি, রাজনীতি আর সংস্কৃতি হয়তো আমাদের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলবে, যদি আমরা সতর্ক না হই।

করোনার আগমনের প্রথম দিকে দুনিয়া হারায় এর এক সুসন্তান মাইকেল সরকিনকে। এই মহান চিন্তক, আর্কিটেক্ট মার্চের ২৬ তারিখে মারা যান এবং জিজেক এই বইয়ের উৎসর্গে বলেন যে এ বই মাইকেল সরকিনের জন্য, আমি জানি, সে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আমি সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নই।

গুরু হেগেলের দীক্ষায় দীক্ষিত জিজেক সারা জীবন উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করেছেন একটি বিশাল, দুনিয়া কাঁপানো প্যানডেমিকের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ লিখবেন বলে। অধিক উত্তেজনায় হয়তো সেই গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ তিনি লিখতে পারেননি, অতি তাড়াহুড়া করেছেন, তবে সরকিনকে উৎসর্গ করা বইটি তাই বলে যে কম গুরুত্বপূর্ণ, তা বলা যাবে না। বিশ্বায়নের যুগে এক বড় বিপর্যয়ের শুরুতে জিজেকের মাপের একজন চিন্তকের নানামুখী দর্শন যেমন লিপিবদ্ধ করা জরুরি ছিল, তেমন তাঁর কিছু কিছু চিন্তা ভীষণ রকম ভাবনা উদ্রেককারী। আর তাড়াহুড়া কিংবা উত্তেজনা থাকলেও উপস্থাপনার দিক দিয়ে বাকপটু জিজেক লেটার মার্ক পেয়ে পাস করবেন, বরাবরের মতোই।

লে খ ক প রি চি তি

আলী রীয়াজ

লেখক ও গবেষক। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো। তিনি ২০০৭ সাল থেকে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের প্রধান ছিলেন। ২০০২ সালে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড ও সাউথ ক্যারোলিনায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি লন্ডনে বিবিসিতে সাংবাদিকতা করেছেন পাঁচ বছর। ২০১৩ সালে ড. রীয়াজ ওয়াশিংটনের উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কলারসে পাবলিক পলিসি স্কলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, বাংলাদেশের রাজনীতি, মাদ্রাসাশিক্ষা, রাজনৈতিক ইসলাম এবং সহিংস উগ্রবাদ। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *আনডায়িং ইস্যুজ* (২০১৮), *লিভড ইসলাম অ্যান্ড ইসলামিজম ইন বাংলাদেশ* (২০১৭), *বাংলাদেশ : আ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি সিনস ইনডিপেনডেন্স* (২০১৬)। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো *ভয়ের সংস্কৃতি : বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি* (২০১৪)।

মো খায়রুল ইসলাম, শেহলীনা আহমেদ ও শিশির মোড়ল

মো খায়রুল ইসলাম ও শেহলীনা আহমেদ জনস্বাস্থ্য পেশাজীবী এবং শিশির মোড়ল *প্রথম আলো*র সাংবাদিক।

পাভেল পার্থ

লেখক ও গবেষক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা *মধুপুরের প্রাণবৈচিত্র্য*, *অরণ্যের লড়াই*, *খাদ্য-লঙ্ঘন ও লড়াই*, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা*, *কৃষকের বীজ অধিকার* ইত্যাদি। ছোটকাগজ, জার্নাল, নানা স্থানীয় প্রকাশনাসহ পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। বারসিক নামক লোকজ্ঞানবিষয়ক একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে। দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন উন্নয়ন অধ্যয়নের ওপর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জার্মান ভাষার ওপর

পড়াশোনা করেছেন জার্মানির ম্যাক্স ভেবার হাউস, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গবেষক ও পরামর্শক হিসেবে তিনি কাজ করেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই ও লেখা তিনি মূল জার্মান, ফরাসি ও রুশ থেকে অনুবাদ করেছেন।

শাহাদুজ্জামান

শাহাদুজ্জামানের জন্ম ১৯৬০ সালে ঢাকায়। গল্প ও উপন্যাস তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্র হলেও গবেষণা, অনুবাদ, ভ্রমণ এবং প্রবন্ধ সাহিত্যেও উল্লেখযোগ্য রচনা রয়েছে তাঁর। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করার পর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে। পরবর্তীকালে জনস্বাস্থ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলে কর্মরত।

সাইমুম পারভেজ

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পিএইচডি গবেষক। তাঁর পিএইচডি গবেষণার বিষয় হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়া ও বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদ। 'বাংলাদেশি ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিস্টস : হোয়াট ডু উই নো' শিরোনামে অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে তাঁর একটি গবেষণা নিবন্ধ *টেররিজম অ্যান্ড পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স* জার্নালে (২০১৮) প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া 'এক্সপ্লেইনিং পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স ইন কনটেমপোরারি বাংলাদেশ (২০০০-২০১৭)' শিরোনামে তাঁর লেখা একটি অধ্যায় রাউটলেজ প্রকাশনীর *পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স ইন সাউথ এশিয়া* (২০১৮) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ

পেশায় ক্রীড়া সাংবাদিক। এ ছাড়া ফ্রিল্যান্স গবেষক হিসেবে কাজ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ এবং টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। সিনেমা, ইতিহাস ও অর্থনীতি নিয়ে লেখালেখি করেন। কয়েকটি ভাষা নিয়ে চর্চা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হলো ইউপিএল থেকে প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত বেস্টসেলার *স্যাপিয়েন্স* বইয়ের বাংলা অনুবাদ।

সারা বছর সেরা বই

আকবর আলি খান
- দারিদ্র্যের অর্থনীতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ২য় মুদ্রণ। ৳ ৭২০
- বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ৪র্থ মুদ্রণ। ৳ ২৬০
- অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি ৮ম মুদ্রণ। ৳ ৭০০
- আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি ১৪তম মুদ্রণ। ৳ ৫২০

আনিসুজ্জামান
- বিপুলা পৃথিবী ৭ম মুদ্রণ। ৳ ৮০০
- চেনা মানুষের মুখ ২য় মুদ্রণ। ৳ ৩৬০
- সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি : দশটি বক্তৃতা ৳ ৩০০

মতিউর রহমান
- খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ড ১৯৫০ ৩য় মুদ্রণ। ৳ ৩০০
- মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি ২য় সংস্করণ। ৳ ৫০০
- আকাশভরা সূর্যতারা : কবিতা-গান-শিল্পের ঝরনাধারায় ২য় মুদ্রণ। ৳ ৮০০
- ইতিহাসের সত্য সন্ধানে : বিশিষ্টজনদের মুখোমুখি ৩য় মুদ্রণ। ৳ ৬০০

সম্পাদনা : মতিউর রহমান
- বঙ্গবন্ধু : শ্রদ্ধায় ভাবনায় স্মৃতিতে ৳ ২৫০

বদরুল আলম খান
- বিশ্বায়ন : ইতিহাস ও গতিধারা ৳ ৪৫০
- গণতন্ত্রের বিশ্বরূপ ও বাংলাদেশ ৳ ৪০০

এম এম আকাশ
- বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি ২য় মু.। ৳ ৪৫০

মালেকা বেগম
- শুভ্র সমুজ্জ্বল : জীবনসঙ্গীর আয়নায় ও অন্যান্য ৳ ৩৮০
- ইলা মিত্র ৪র্থ মুদ্রণ। ৳ ৩৫০
- পুষ্পকুন্তলা : বিপ্লবী সূর্য সেনের জীবনসঙ্গিনী ৳ ২০০
- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ৳ ১৫০

সম্পাদনা : আল মাসুদ হাসানউজ্জামান
- বাংলাদেশে নির্বাচন ৳ ৫৫০

Nurul Islam
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : কাছে থেকে দেখা ৳ ২২০
- An Odyssey: The Journey of my life ২য় মুদ্রণ। ৳ ৬০০
- India-Pakistan-Bangladesh : A Primer on Political History ৳ ২০০
- Corruption, Its Control and Drivers of Change : The Case of Bangladesh ৳ ২০০

Ali Riaz
- How Did We Arrive Here? ৳ ৩৫০
- Inconvenient Truths About Bangladeshi Politics ২য় মুদ্রণ। ৳ ৪৫০
- Lived Islam & Islamism In Bangladesh ২য় মুদ্রণ। ৳ ৬০০

Rounaq Jahan
- Political Parties In Bangladesh ২য় মুদ্রণ। ৳ ৫৫০

ProthomaProkashon

প্রথমা প্রকাশন
- ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৭
- ৪৩-৪৪ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৬

অনলাইনে বই কিনুন : www.prothoma.com

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে প্রতিচিন্তার গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। এ ছাড়া বিকাশের মাধ্যমেও গ্রাহক হওয়া যাবে (বিকাশ নম্বর : ০১৯৫৫৫৫২০৬৯)। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ৪০০ (চার শ) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮০০ (আট শ) টাকা ও ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে),
গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬